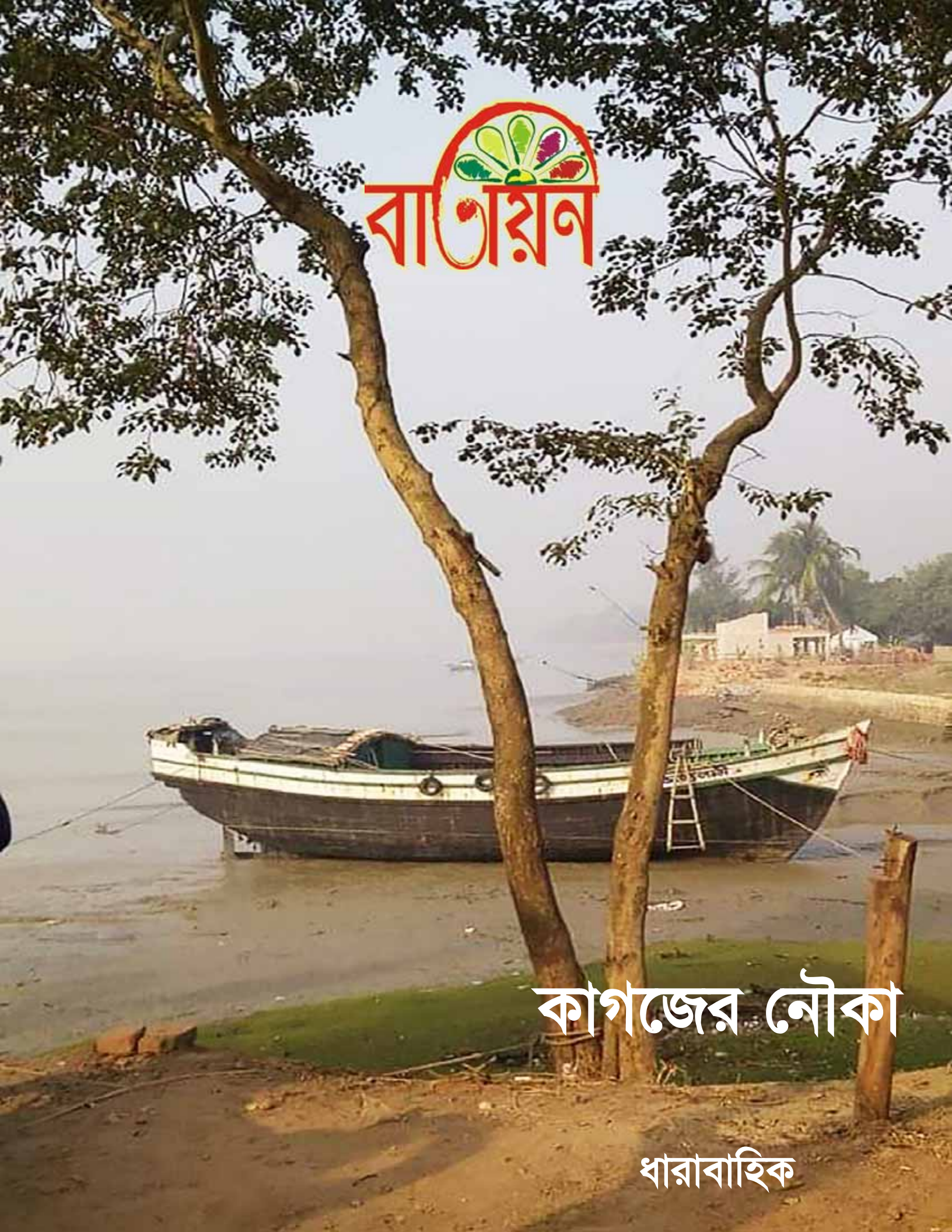

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

ধারাবাহিক

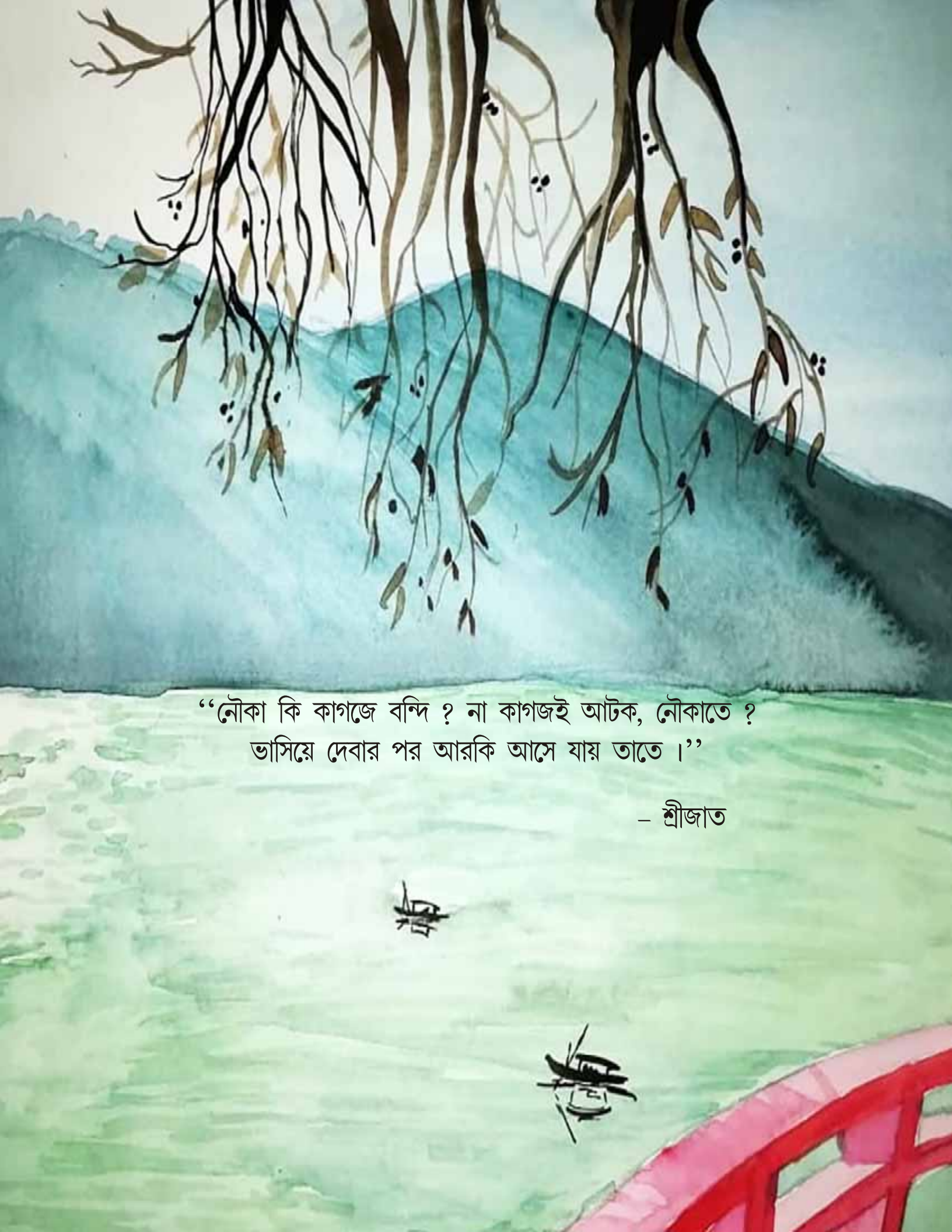

''নৌকা কি কাগজে বন্দি ? না কাগজই আটক, নৌকাতে ?
ভাসিয়ে দেবার পর আরকি আসে যায় তাতে ।''

– শ্রীজাত

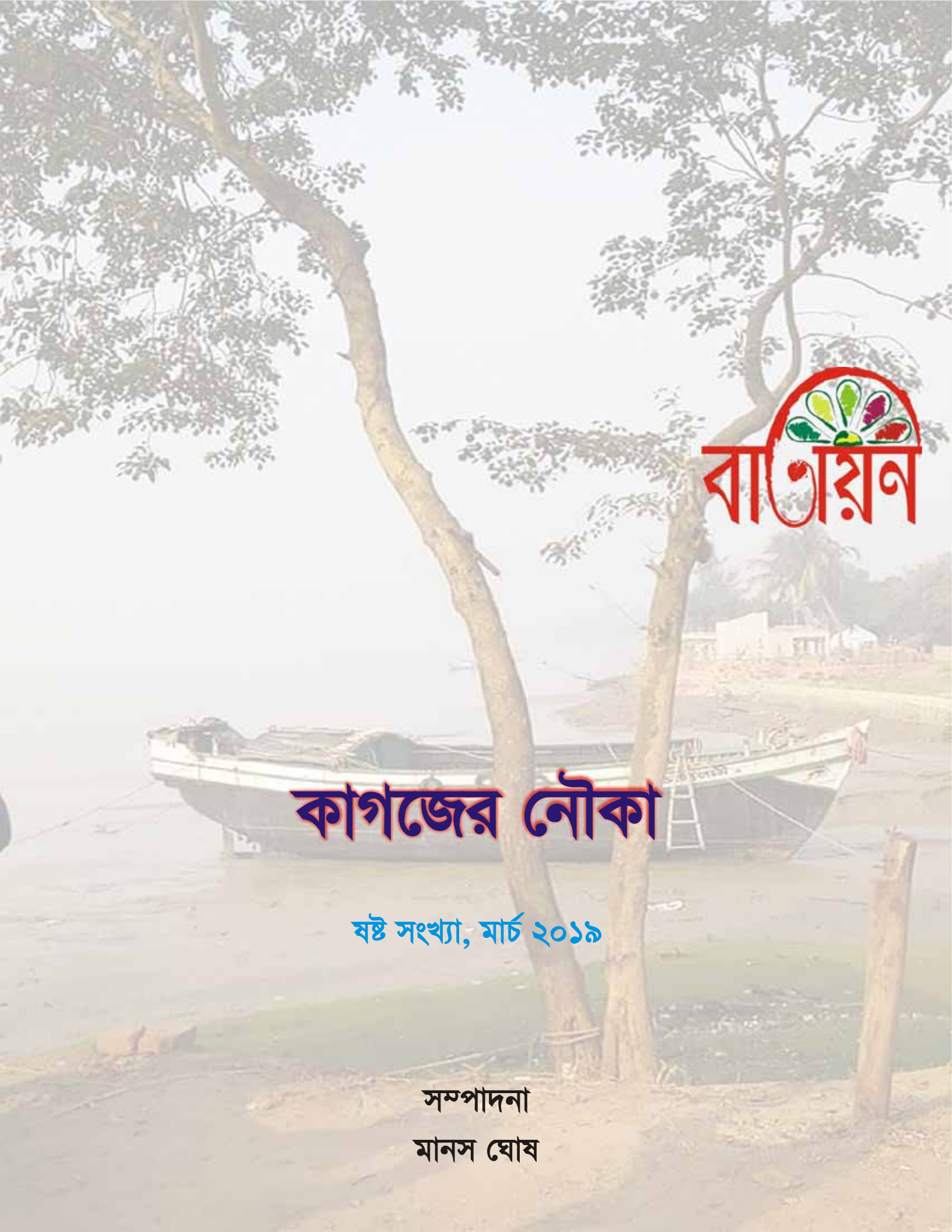

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

ষষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ২০১৯

সম্পাদনা

মানস ঘোষ

Issue Number 6 : March 2019

Editor
Manas Ghosh, Kolkata, India

Editorial Team
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA
Jill Charles, IL, USA (English Section)

Coordinator
Manas Ghosh, Kolkata, India
Snehasis Bhattacharjee, Kolkata, India

Networking & Communication
Biswajit Matilal, Kolkata, India

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Design and Support
Susanta Nandi, India

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Benjamin Ghosh — **Front & Front Inside Cover and Illustrations**

বেঞ্জামিন ঘোষ (মাঙ্গল্য) এখনো স্কুলছাত্র। তবে তার যাবতীয় আগ্রহ আবর্তিত হচ্ছে, ছবি আঁকাকে ঘিরে । পেন্সিল স্কেচ, রং-তুলি ছাড়াও সে ভালবাসে বিভিন্ন অপ্রচলিত উপাদানকে শিল্পের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে। অন্যান্য কাজের সঙ্গে নিয়মিত কমিক্স এঁকে চলেছে ছোটদের একটি শিক্ষামূলক পত্রিকার জন্য । বাতায়নের ধারাবাহিক পত্রিকায় বেঞ্জামিনের এই প্রথম কাজ । অতএব আমাদের সঙ্গে সেও তাকিয়ে আছে পাঠকের প্রতিক্রিয়ার দিকে ।

Sugandha Pramanik — **Back Inside Cover**

Dr. Sugandha Pramanik is a lecturer in Applied Psychology in Kolkata. She is an avid reader, culinary enthusiast and a classical music lover.

Tirthankar Banerjee — **Back Cover**

His interest in photography started in student days. Much later the long nights in the dark-room were replaced by hours behind the computer and focus shifted from Black & White to Colour. He likes to show the images as they are and does not approve of computer gimmickry. He loves nature – flowers, birds, trees and all things beautiful. Tirthankar is an engineer, specializing in Renewable Energy and lives and works in Perth, Western Australia.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

সুধী,

প্রথমেই সবাইকে জানাই ফালগুনী শুভেচ্ছা !

এই বাংলার পলাশের রঙ, বসন্তের সৌরভ যেন ছুঁয়ে যায় বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা আমাদের সুজন সুহৃদদের। শীতের পাতাঝরা গাছ সজীব হয়ে ওঠে বসন্ত সমাগমে। বসন্ত মানেই নতুনের আবাহন। তাই আমরাও নতুন নতুন খুশীর খবর নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে।

মাত্র ছ'মাস বয়স। এর মধ্যেই জনপ্রিয়তায় পাল্লা দিচ্ছে দেশবিদেশের নানা অনলাইন পত্রিকার সঙ্গে। হ্যাঁ, বাতায়নের মাসিক সংস্করণ "কাগজের নৌকা"র কথা বলছি। প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল বড়গল্প, উপন্যাস, ট্রাভেলগ ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা। শুরু হয়েছিল কিছু দুর্দান্ত উপন্যাস, গল্প, রম্যরচনা, সনেট-সিরিজ দিয়ে, ট্রাভেলগের ফটো আর গল্পের সঙ্গে হাতে আঁকা ছবি ছিল আলাদা আকর্ষণ।

কিন্তু পাঠকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা লক্ষ্য করে নতুন সাজে সজ্জিত হচ্ছে "কাগজের নৌকা"। ধারাবাহিকগুলি তো থাকছেই। তাছাড়া থাকছে আরো দুর্দান্ত সব গল্প, কবিতা, ছবি, রম্যরচনা, ইত্যাদি। শুরু হতে চলেছে ইংরাজি বিভাগ, The Paper Boat! অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থেই ত্রৈমাসিক বাতায়নের মাসিক সংস্করণ হতে চলেছে কাগজের নৌকা।

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণের কথা তো এখনো বলাই হয়নি ! প্রকাশিত হচ্ছে সাহিত্যিক রমা জোয়ারদারের "চা ঘর" ২য় পর্ব। বাতায়ন, দেশ, আনন্দবাজারে কবিতা ও ছোটগল্পে মন মাতিয়ে সাহিত্যিক সৌমিত্র চক্রবর্তী এবার কাগজের নৌকায় এলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস "সময়" নিয়ে। এছাড়াও কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব ও কবি সমর সেন-কে নিয়ে অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়ের একটি সংগ্রহযোগ্য আলোচনা সমৃদ্ধ করেছে এবারের পত্রিকাটিকে। আমাদের এই নতুনের যাত্রাপথে লেখক ও পাঠকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আর পরামর্শ প্রার্থনা করছি। আশাকরি নিরাশ করবেন না।

"ওরা চিরকাল টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল . . ."

নৌকা কাগজের হলেও কাউকে তার হাল ধরতে হয়, আবার কাউকে দাঁড়ও টানতে হয়। তাই কাগজের নৌকার এই নতুনতর অভিযানের শুরুতে আমি তাঁদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই, অক্লান্ত জানলাদি ও তাঁর টীম বাতায়নকে।

এই লেখা প্রকাশিত হবে ২৬শে মার্চ-এর ক'দিন পরেই। যে ভাষায় আজ লিখছি সে ভাষার উপরই ভিত্তি করে অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর জন্ম হয়েছিল একটি নতুন রাষ্ট্রের, বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান। দেশবিদেশের বাংলাদেশী পাঠকদের জানাই জাতীয় দিবসের আন্তরিক অভিনন্দন !

আরো একবার আমার ভুবনডাঙার স্বজন-সুজনদের শুভেচ্ছা জানিয়ে, আজ আসি। ভালো থাকবেন।

মানস ঘোষ
সম্পাদক / কাগজের নৌকা।

সূচীপত্র

ধারাবাহিক উপন্যাস

নবকুমার বসু	হটাবাহার	5
সৌমিত্র চক্রবর্তী	সময়	35

রম্যরচনা

স্বর্ভানু সান্যাল	গুগল	21

কবিতা

পল্লববরন পাল	সনেটগুচ্ছ	24
সঞ্জয় চক্রবর্তী	সহজাত	25

ধারাবাহিক গল্প

রমা জোয়ারদার	চা-ঘর	39

প্রবন্ধ

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়	এই ফড়িঙের বাগানে একাকী এক গাছ	26

ধারাবাহিক উপন্যাস

নবকুমার বসু

হটাবাহার

পর্ব ৬

(১১)

ন্যাশানাল হোম-ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়র মিস্টার প্যারট, সুদীপাকে বললেন, ম্যাডাম, দিস ড্যামেজ ইন ইয়োর হোম ইজ নট ভেরি আনকমন।

সুদীপা বললেন, কিন্তু এতো একসটেন্সিভ ড্যামেজ . . . খুব একটা শুনি নি তো . . . !

শোনেন নি তার কারণ . . . ইদানীং ইংল্যান্ডে এতো তুষারপাত হয় না, একটানা এতোদিন মাইনাস টেম্পারেচার হয়েও থাকে না . . . দিস ইয়ার ওয়াজ একেসপশনালি কোল্ড।

অনেক বাড়িতেই কি এভাবে পাইপ বার্স্ট করে শিলিং ড্যামেজ হয়েছে ?

ওয়েল . . . ইন কম্পারিজন টু রিসেন্ট ইয়ারস . . . এ বছর নিশ্চয়ই বেশি।

সুদীপা জিগ্যেস করলেন, এবং সব ক্ষেত্রে একই কারণ ?

কিচেন এবং ইউটিলিটি রুমের এপাশ-ওপাশ তাকাতে তাকাতে ইঞ্জিনিয়ার বললেন, পাইপ বার্স্ট করার কারণই হচ্ছে ভিতরে জল জমাট বেঁধে যাওয়া। তারপর আবার যখন আইস মেল্ট করতে শুরু করবে . . . অবভিয়াসলি সেই জল সিলিং তো ড্যামেজ করবেই।

কিন্তু রুম-টেম্পারেচার ঠিক থাকলেও আইস জমে যাবে কেন ?

ম্যাডাম . . . 'ঠিক থাকা' ইন আ রিলেটিভ টার্ম। হলিডে-তে চলে যাওয়ার সময় অনেকেই . . . ইভ্ন ইন উইন্টার রুম-টেম্পারেচার অনেক কমিয়ে যান। হয়তো খুব বেশিদিন ফ্রিজিং টেম্পারেচার থাকে না . . . তাই প্রবলেম হয় না। ইন্সিডেন্টালি এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে তো জানেনই . . . একটানা কতদিন বিলো ফ্রিজিং . . .

সুদীপা ভদ্রলোকের কথার মধ্যেই বলে উঠলেন, আমি কিন্তু ইন্ডিয়া যাওয়ার আগে . . . রেডিয়েটর এ্যাডজাস্ট করে দু-বেলাই এ্যাডিকুয়েট হিটিং-এর ব্যবস্থা করে গিয়েছিলাম মিস্টার প্যারট।

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। তারপর হাতের ছোট কম্পিউটার সুদীপাদের কিচেন-টেবিলের ওপর রেখে বললেন, ইয়েস . . . অফকোর্স আই মেড আ নোট অব দ্যাট। ইনফ্যাকট্ আমাদের ইন্স্পেকশনে আসার কারণই হচ্ছে, সবকিছু খুঁটিয়ে দেখে এ্যাসেস্ করা। বাড়ি ড্যামেজ হওয়ার জন্য ওনারের দিক থেকে কোনো ঘাটতি ছিল কিনা . . . ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানি শুধু সেটুকুই জানতে চায় এবং আমাদের সেই রিপোর্ট দিতে হয়।

আমাদের বাড়ির ব্যাপারে কোনো ঘাটতি আছে বলে আপনার মনে হয় ? সো ফার এ্যাজ আই ক্যান সি . . . ইট এ্যাপিয়ারস ওকে ম্যাডাম। শুধু কয়েকটা টার্মস এ্যান্ড কন্ডিশনস ভেরিফাই করে নিতে হবে।

সুদীপা বললেন, সেগুলো আমি সব পড়ে দেখেছি . . . ঠিক আছে।

তাহলে কোনো কথাই নেই। ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানি উইল টেক আপ দ্য জব।

মিস্টার প্যারট, সেটা কতদিনে শুরু হতে পারে বলে আপনার মনে হয় ? কারণ . . . সিন্স্ আই রিটার্নস ফ্রম ইন্ডিয়া . . . আমি এখানে এক নেবার-এর বাড়িতে রয়েছি . . . অলসো দে আর গুড ফ্রেন্ডস্ . . . ।

ভদ্রলোক একটু অবাক চোখে তাকালেন সুদীপার দিকে । তারপর বললেন, ওহ্ আই সি . . । কিন্তু আপনার তো অন্য কারুর বাড়িতে থাকার দরকার নেই . . . যতদিন না আপনার বাড়ি বাসযোগ্য হচ্ছে, কোম্পানিই আপনার বোর্ডিং এ্যান্ড লজিং-এর ব্যবস্থা করবে . . . ।

সুদীপা বললেন, সেটা আমার জানা ছিল না । অবশ্য এরকম সমস্যাও তো আমার আগে হয় নি ।

মিস্টার প্যারট বললেন, মিসেস রয় . . . সেটাই সিস্টেম । . . . আপনি এখনই আমাকে একটা ছোট্ট এ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দিন । এ্যালং উইথ মাই রিপোর্ট আমি আজই ওটা সাবমিট করে দেব । হোপফুলি ইন আ ডে ওরা এই পিটার্লিতেই কোনো হোটেলে আপনার থাকা-খাওয়া . . . সব ব্যবস্থাই করে দেবে । কাইন্ডলি ইমেল এ্যাড্রেসটাও দেবেন . . . ।

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে তারপরেও সুদীপা বললেন, মিস্টার প্যারট . . . বাড়ির কাজটা যাতে একটু তাড়াতাড়ি শুরু করা যায় . . . ।

ডোন্ট ওয়ারি, মিসেস রয়, প্যারট বললেন, ও ব্যাপারে ইন্সিওরেন্স কোম্পানির নিজেদেরই তাড়া থাকবে ।

কথা হচ্ছিল সুদীপারদের সিল্ক উইলোবির বার্চভিউ ক্লোজ-এর বাড়িতেই ।

সুদীপা ইংল্যান্ডে ফিরেছেন আজ তৃতীয় দিন ।

বারণ করা সত্বেও যথারীতি বিদিশা এবং সুনন্দন গিয়েছিলেন ওঁকে নিউক্যাস্ল বিমানবন্দর থেকে বাড়িতে নিয়ে আসতে । কিন্তু নিজের বাড়ি না, এবারই প্রথম কলকাতা থেকে ফিরে অন্য জায়গায় অর্থাৎ বিদিশাদের বাড়িতে উঠতে হল । উপায় ছিল না । কেননা নিজের বাড়িতে জল-বিদ্যুৎ ছিল না । আরও কী কী ক্ষতি হয়েছে তখন জানা ছিল না সুদীপার ।

বিদিশা অবশ্য সত্যি আপনজনের মতোই সুষ্ঠ আয়োজন করে রেখেছিলেন সুদীপার থাকার জন্য । এ-ও জানতেন, জার্নি করার ধকল একটু চলে গেলেই, সুদীপার যথেষ্ট সুবিধা হবে এ-বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে যাতায়াত, কাজকর্ম করানোর জন্য । সুদীপার অবশ্য অস্বস্তির ভাবটা তা সত্বেও যায় নি । বলেছিলেন, আমার জন্য সব ব্যাপারেই তোমাদের বড্ড ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে বিদিশা ।

বিদিশা ওই কথোপকথনের বিষয়টা গোড়া থেকেই গুরুত্বহীন করে দিতে চেয়েছিলেন ।

বলেছিলেন, শোনো দীপা, বিদেশবিভুঁই-এ প্রায় পাশাপাশি বাড়িতে, একপাড়ায় থেকে যদি এটুকুও কাজে না লাগি . . . তাহলে তো মানুষ বলে পরিচয় দেওয়াই উচিৎ না আমাদের ।

সুদীপা বলেছিলেন, না- না একথা বোলো না । তোমরা আমাদের কতটা কাছের মানুষ . . . সেটা রজতাভ বেঁচে থাকার সময়েও জানতাম ।

বিদিশা বললেন, তাহলে আর এটুকুর জন্য আমরা ঝামেলায় পড়ব ভাবছো কেন ?

সুদীপা বললেন, ‘এটুকু’ টা যে কতটা হবে . . . এখনও তো তার কোনো আন্দাজই নেই বিদিশা । গাড়িতে এয়ারপোর্ট থেকে সিল্ক উইলোবি-র বাড়িতে ফিরতে ফিরতে এবার কথায় যোগ দিয়েছিলেন সুনন্দন ।

সুদীপার কথা শুনে গাড়ি চালাতে চালাতেই বললেন, ব্যাপারটা যতটুকুই হোক দীপা, যে কদিনের ব্যাপারই হোক . . . রজত আজ বেঁচে থাকলেও তোমাদের বাড়িতে এই ঘটনা ঘটতে পারতো এবং সেক্ষেত্রেও . . . আমরা এখানে থাকতে তোমরা অন্য জায়গায় গিয়ে উঠতে কি ? নাকি আমরা তাই দিতাম !

সুদীপা মিন মিন করেই বলেন, একটা অস্বস্তি তো হয়ই নন্দনদা। নিজের বাড়ি থাকতে . . . ।

ওটা একেবারেই ভাববে না, মাথা থেকে তাড়াও। সুনন্দন বলেছিলেন। সঙ্গে যোগ করেছিলেন, তবে নিজের বাড়ির কমফর্ট-টা অবশ্য পাবে না . . . কিন্তু সেটা কিচ্ছু করার নেই।

সুদীপা বলেছিলেন, কমফর্ট আরও বেশিই হবে . . . সে কি আর জানি না !

বিদিশা বলেছিলেন, কয়েকটা দিন তুমি আমাদের সঙ্গে থাকলে . . . সত্যি ভাল লাগবে দীপা . . . । এমনিতে তো থাকা হবে না . . . কিন্তু এখন বাড়ির কাজ না- করিয়ে যেতে পারবে না . . . তোমার কম্পানি এনজয় করব কটা দিন . . . ।

তখন অবশ্য সত্যি কোনো ধারণা ছিল না সুদীপার, জলের পাইপ বার্স্ট করে বাড়ির কিরকম ক্ষতি হয়।

সেদিনটা আর বেরুনো হয়নি বিদিশার বাড়ি থেকে। পরের দিন সকালে সুনন্দন হাসপাতালে চলে যাওয়ার পরে দুই বন্ধু ও প্রতিবেশী হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ির চাবি নিয়ে এসেছিলেন সুদীপাদের বাড়িতে। আর সত্যি বলতে কি দুমাস বন্ধ থাকা বাড়ির দরজা ঠেলে ঢুকতেই যেন একটা শক্ লাগার মতো অনুভূতি হয়েছিল সুদীপার।

এদিকে সদ্য মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে দেশের আবহাওয়া আর প্রকৃতিতে ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠার মতো সতেজভাব বেশ স্পষ্ট। দিন বড় হয়েছে। ঠান্ডা থাকলেও কনকনানি কম। মেঘের স্তর পাতলা হয়ে সূর্যের আলো পড়ছে স্যাঁতানো ধরণীর গায়ে। কোটর ছেড়ে বেরুতে শুরু করেছে পাখির ঝাঁক। সাদা-হলুদ ড্যাফোডিল ফুটতে শুরু করেছে। অঙ্কুরের উদ্ভাস চেরি গাছের ডালে ডালে। আর ক'দিন পরে সময় একঘন্টা পিছিয়ে গেলেই দীর্ঘদিনের সূচনা হবে। দেশে তখন দ্বারে দ্বারে জাগ্রত বসন্ত।

বাড়ির ভেতর পা-দিতেই সুদীপার মনে হয়েছিল, একটা ঠান্ডা ভাপ এসে গায়ে লাগল। এই প্রথম রজতাভহীন দেশ থেকে ফেরা। ঠান্ডাভাপ যেন মৃত্যুর অনুষঙ্গেই বেশি করে অনুভূত হল। শীতল শূন্যতায় ডুবে থাকা বাড়ির হাওয়া।

যথারীতি ইলেক্ট্রিসিটি নেই। বার্গলার এলার্মও বাজল না।

একটা সোঁদা ভিজে গন্ধ পেতে পেতে রান্নাঘরের দিকে এগিয়েছিলেন সুদীপা। পিছনে বিদিশা। ভেজা, মাটি-মাটি গন্ধ তিনিও পেয়ে থাকবেন। কিচেনের দোরগোড়া থেকেই কারনটা বোঝা গেল। দৃশ্য দেখেও চক্ষু স্থির দুজনেরই। জলে জলময় রান্নাঘরের টাইলস বসানো মেঝে। জল জমে রয়েছে খাওয়ার টেবিলের ওপরেও। আর তার ঠিক ওপরেই সিলিং-এর বেশ খানিকটা ভেঙ্গে গিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে ঝুলছে। খসে পড়ে যায়নি, কিন্তু ঝুলে পড়া সিলিং-এর এ্যাসবেসটাস-এর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে জলের পাইপ, ইলেক্ট্রিকের তার। বোঝা গিয়েছিল, সিলিং আর রুফ-এর মধ্যবর্তী যে ফাঁকের মধ্যে দিয়ে এদেশে যাবতীয় পাইপ, তার ইত্যাদি যাতায়াত করে, সেগুলোই বেরিয়ে পড়েছে - ভিজে নরম হয়ে যাওয়া এবং ঝুলে পড়া সিলিং থেকে। ফেটে যাওয়া পাইপ থেকে নিশ্চয়ই যথেষ্ট জল লিক্ করেছিল, এবং একটানা ঠান্ডার মধ্যে তা এ্যাসবেসটস-এর আস্তরণকে নরম করে দিয়েছে। আপাতত জলের সাপ্লাই, ইলেক্ট্রিসিটি দুই বন্ধ . . . কিন্তু যা জমেছিল তাইতেই রান্নাঘরের দেয়ালেও ড্যাম্প ধরে গেছে। মোটামুটি ব্যাপারটা আন্দাজ করেই দোতালায় উঠেছিলেন সুদীপা। ধীরে ধীরে পা ফেলেছিলেন।

নাহ ওপরে আর বিশেষ কিছু ড্যামেজ হয় নি। কিন্তু একটানা ঠান্ডার মধ্যে থাকায়, ঘরদোর এখনও সব প্রায় বরফ হয়ে রয়েছে। এদিক ওদিক টুকিটাকি নেড়েচেড়ে দেখেছিলেন সুদীপা। চোখ বুলিয়ে নিয়েছিলেন সব কটা ঘরে, বাথরুমে। কিছু জামাকাপড় নিয়ে চলে এসেছিলেন নিচেয়। হোম-ইন্সিওরেন্স-এর ফাইল ইত্যাদি নিয়ে গ্যারেজে গিয়ে গাড়ি স্টার্ট করেছিলেন। প্রায় নতুন বি এম ডবলু গাড়ি অবশ্য ঠিক ছিল, চাবি ঘোরাতেই স্টার্ট হয়েছিল।

আর সময় নষ্ট করেন নি সুদীপা। দরজায় তালা আটকে গাড়িতে বিদিশাকে নিয়েই ফিরে এসেছিলেন ওদের বাড়িতে। বীমা কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন সেদিনই। খুব বেশি ব্যাখ্যা করতে হয় নি, কেননা দু-চার কথার পরেই

টেলিফোনের অপরপ্রান্তের প্রতিনিধিটি বুঝে নিয়েছিলেন সমস্যার বিষয় । উভয় পক্ষের সুবিধামতো সময়ে ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে ইন্সপেকশনের ব্যবস্থাও তখনই হয়ে গিয়েছিল । অন্তত সাময়িকভাবে নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলেন সুদীপা ।

আজ আর একটু নিশ্চিন্ত বোধ করলেন ইন্সপেক্টর সরোজমিন দেখে যাওয়ার পরে । ভদ্রলোক মোটামুটি আশ্বস্তই করে গেছেন ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানির কাজ শুরু করার ব্যাপারে । একটু কৌতুকও বোধ করলেন জেনে, যে, বীমা কম্পানি বাড়ি যাবার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্লায়েন্টকে রাখার ও ব্যবস্থা করে ।

হেঁটে বিদিশাদের বাড়ি ফিরে আসতে আসতে সুদীপা ভাবলেন, ওই খবরটাই বিদিশাকে আগে জানাতে হবে ।

একই সঙ্গে অন্যান্য কাজের ভাবনাগুলোও এবার মাথায় সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন । যাইহোক না কেন, কিছুদিনের মধ্যে আবার যে কলকাতা যেতে হবে, তাইতে কোনো সন্দেহ নেই । পাকাপাকি যদি দেশে ফিরেই যান, তাহলে নিজেদের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও অবশ্যই থাকবেন না; এবং সেক্ষেত্রে সোনাদি — অপুরা মিথ্যা মামলা করে যতই তাঁর অংশ দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করুক, সেটা যে পারবে না, তেমন একটা আন্দাজ এবং আশ্বাস পেয়েছেন লইয়ারের কাছ থেকে । কাঠখড় পোড়াতে হবে । আর সেই কারণেই এদেশে টাকাপয়সার বিলিবন্টন থেকে শুরু করে, এই বাড়িরও কিছু ব্যবস্থা করে যেতে হবে । এখনই বিক্রির নোটিশ না দিলেও জাল গোটানোর ভাবনা ভাবতে হবে ।

সত্যি বলতে কি, কলকাতায় গিয়ে বাড়ির ঝামেলা সামলাতেই এতো ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন সুদীপা, যে অন্যান্য পুরনো বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তো যোগাযোগই করতে পারেন নি । অথচ বিদেশবাস উঠিয়ে ফিরে যাবেন তাদের আশাতেই তো ! এক-আধবার টেলিফোনে যোগাযোগ হয়েছিল বটে, কিন্তু তা পুরনো ঘনিষ্ঠতা ঝালিয়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয় ।

কয়েকজনের সঙ্গে কথোপকথন নেহাতই অভিসার আর অভিযোগেই সীমাবদ্ধ ছিল । সুদীপা মনে করেও রেখেছেন । পরের বার গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের উদ্যোগ নিতেই হবে । মা এবং বাবার দিকের অনেক আত্মীয়স্বজন প্রতিবারই অভিযোগ করেন, সুদীপারা বিলাত থেকে কবে আসে আর চলে যায়, তাঁরা তো জানতেই পারেন না ।

নিশ্চয়ই সকলে রজতের মৃত্যুসংবাদ জানেন । প্রীতিলতার কাছে দুঃখপ্রকাশ ও করেছেন অনেকে । কলকাতায় গিয়ে থাকতে শুরু করলে, এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, রাখতেও হবে ।

মিনিট তিনচারের মধ্যেই সিল্ক্ উইলোবির আর এক মাথায় বিদিশাদের বাড়িতে ফিরে গেলেন সুদীপা । একটা অতিরিক্ত বাড়ির চাবি বিদিশা দিয়েই রেখেছেন বন্ধুর কাছে — স্বাধীনভাবে সুদীপার যাওয়া — আসার জন্য । এমনিতে ওঁরাও শুধু দুজনই বাড়ির সদস্য এখন । একমাত্র ছেলে বিবেক (আসলে বিবেকানন্দ ঘোষাল) ডাক্তার, কিন্তু থাকে স্কটল্যান্ডে, এডিনবারার কাছে । খুব একটা নিয়মিত যাওয়-আসা করতে পারে না । অভ্যাশবশত হয়তো আর চায়-ও না ।

চাবি ঘুরিয়ে সুদীপা ঢোকামাত্রই রান্নাঘরের দিক থেকে এগিয়ে এলেন বিদিশা । বললেন, আর দুমিনিট আগে এলেই তোমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারতে দীপা ।

ঘরের চটি পরতে পরতে সুদীপা বললেন, ওহ তাই ! মুনিয়া ফোন করেছিল ? কোনো জরুরি দরকার ছিল নাকি ? না সেসব কিছু বলে নি । আবার রান্নাঘরের দিকেই যেতে-যেতে বললেন, আজকে ও হাফ-ডে পেয়েছে বাড়িতে আছে . . . তুমি সময়মতো ফোন কোরো । ইঞ্জিনিয়ার সব দেখে শুনে গেল ?

হ্যাঁ . . . ওদিকে সব ঠিক আছে . . . আশা করা যায় ইন্সিওরেন্স কোম্পানি তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করবে । কথা বলতে বলতেই সুখাদ্যের গন্ধ পাচ্ছিলেন সুদীপা । লাঞ্চ্ টাইমও হয়ে গেছে । বললেন, প্রচুর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করছো নাকি বিদিশা !

প্রচুর কিচ্ছু না . . . জাস্ট্ একটু অন্যরকম। হাত মুখ ধুয়ে সোজা এসে বসে পড়ো . . . খেতে খেতে কথা বলব।

রান্নাঘরের ছোট টেবিলেই লাঞ্চ্ সারতে বসে পড়েছেন দুই বন্ধু। একটু সাহেবি খাবার বানিয়েছেন বিদিশা। রোস্ট চিকেন, ম্যাশড্ পোটাটো, বেকড বিন, বয়েলড ভেজিটেবল আর গার্লিক ব্রেড।

ভাল লাগছে দীপা . . . খেতে পারছো ?

ছুরি আর কাঁটা দিয়ে চিকেন সদব্যবহার করতে করতে সুদীপা বললেন, কলকাতা থেকে এসে পর্যন্ত তোমার বাড়িতে যে পরিমান খাচ্ছি বিদিশা . . . মনে হচ্ছে জামাকাপড় আর গায়ে ফিট্ করবে না। তারপরেও বলছো খেতে পারছি কিনা !

সত্যি কী যে বলো ! বিদিশা বললেন। এসেছো তো তিনদিন !

বিশ্বাস করো তাইতেই মনে হচ্ছে আমি ওয়েট পুট অন করেছি।

কিছুই তো স্পেশাল করি না তোমার জন্য . . . নিজেরা বাড়িতে খাই তুমিও তাই খাচ্ছো।

সুদীপা বললেন, তুমি কি জানো বিদিশা . . . বাড়ি-ঘরদোর ঠিক না হওয়া পর্যন্ত, এই সময়টা নাকি ইন্সিওরেন্স কোম্পানির আমাকে কোনও হোটেলে কিংবা গেস্টহাউসে রাখার কথা . . .। সেটাই নাকি সিস্টেম।

তাই নাকি ! বলতে বলতেই চোখেমুখে বিষাদ মিশিয়ে বন্ধুর দিকে তাকালেন বিদিশা।

তুমি তাহলে হোটেলে গিয়ে থাকবে ?

তাই তো উচিৎ গো . . . তোমাদের ঘাড়ে পড়ে না থেকে . . .।

প্লিজ ওটা বোলো না তো . . . ! কটা দিন তুমি আছো বলে মনটা যা ভালো হয়ে রয়েছে . . .। মাঝেমাঝে এখনই আমি ভাবতে শুরু করেছি, তুমি যদি সত্যি দেশে ফিরে যাও . . . আমি আর সিল্ক্ উইলোবিতে থাকতে পারব না।

ফিরে যাওয়ার প্রসঙ্গ উঠলেই কোথায় যেন একটা টানাপোড়েনে পড়ে যান সুদীপা। কিছুতে যেন একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না এখনও। আর কিছু না হোক, শুধুমাত্র আবহাওয়া আর নিঃসঙ্গতা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই কি কলকাতায় ফিরে যাওয়া উচিৎ না ! এখন এই মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে যদিও আবহাওয়ার উন্নতি হতে শুরু করেছে, তাহলেও এই চুপচাপ, শুনশান, পরিবেশ আর নিঃসঙ্গতা থেকে উদ্ধার কোথায় ! এই মুহূর্তে না হয় বিদিশাদের কাছে, ওদের সঙ্গে রয়েছেন। কিন্তু আসলে তো থাকতে হবে একা। একেবারে একাই।

মুখে সুদীপা বললেন, সবই অভ্যাসের ব্যাপার বিদিশা।

বিদিশা বললেন, ওটা সাহেবরা পারে . . . আমাদের পক্ষে কি সম্ভব ! একটু থেমে বিদিশা আবার বললেন, আমি মাঝেমাঝে তোমার সিচুয়েশনটা ভাবি দীপা . . . তুমি কলকাতায় ফিরে গেলে সত্যি আমাদের কিছু বলার নেই।

মাথা নাড়তে নাড়তে চুপচাপ খেয়ে চললেন সুদীপা। ওদিকে কী ঘটছে কে জানে!

ঠিক পর মুহূর্তেই বিদিশার প্রশ্নে নিজের ভাবনারই প্রতিফলন ঘটল। বিদিশা বললেন, কলকাতার অবস্থা নিয়ে তোমার সঙ্গে কথাই হল না। কেমন দেখলে? সব ঠিকঠাক চলছে?

মাথা নিচু করে খেতে খেতে নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন সুদীপা। তারপর বললেন, কীযে বলব তাই ভাবছি...।

বিদিশা একটু ভুরু কুঁচকে তাকালেন। বললেন, কী হল দীপা! কলকাতার কথায় অমন হতাশ ভাব কেন তোমার মুখে?

হতাশা - শব্দটাই ঠিক বলেছো বিদিশা। সুদীপা বললেন। আশা যখন হত হয়... তখন তো হতাশ হওয়ারই কথা। তাই না! তোমাকে কি সেরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে?

হতাশ বললেও বোধহয় সবটা বলা হয় না বিদিশা।

সে কী! সেরকম কোনো হিন্ট্ দাও নি তো আগে! কিছু বলো নি তো আগে!

সুদীপা মাথা নেড়ে বললেন, কী বলব, ! ওপর দিকে মুখ করে থুতু ফেললে... সে তো নিজের গায়েই এসে পড়ে। বিদিশা চুপ করে রইলেন।

বুঝতেই পেরেছেন, সুদীপার কলকাতা গিয়ে হতাশ হওয়ার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই খুবই ব্যক্তিগত এবং সম্ভবত পারিবারিক। ওই বিষয়ে আর কোনো প্রশ্ন করা কতখানি সৌজন্যের পরিচয় হবে, তা ভেবেই, মাথা দোলাতে দোলাতে নীরব হয়ে রইলেন। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

হাতে জলের গ্লাস নিয়ে সুদীপাই আবার বললেন, কী জানো বিদিশা... কিছু কিছু নিজের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং একদিনের প্রিয় মানুষ যে তলে তলে এতো লোভী-হৃদয়হীন এবং কোরাপ্টেড হয়ে যেতে পারে... আমার তা মাথাতেই আসে নি। অথচ এবারই কলকাতায় গিয়ে শুনলাম, এসব ঘটনা নাকি জলভাত... বিশ্বাস করে তুমি কাউকে কিছু দিয়ে এলে, সে বা তারাই তোমাকে ঠকাবে, তারাই সব মেরে দেবে - এটা নাকি নরম্স্...।

মন্তব্যহীন অবাক চোখে বিদিশা তাকিয়ে রইলেন বন্ধু ও প্রতিবেশিনীর দিকে।

সুদীপা বললেন, এবারই প্রথম কলকাতা গিয়ে বুঝতে পারলাম, এতো বছর ইংল্যান্ডে থেকে, জীবনযাপন করে... আমরা দেশের এখনকার একটা ক্লাস অব পিপ্ল-এর মানসিকতা সম্পর্কে কিছুই জানি না। দেশের সোসিও-পোলিটিক্যাল এবং ইকোনমিক সিচুয়েশন এই শ্রেণীর লোকদের ভ্যালুজ একেবারে পালটে দিয়েছে... আনফরচুনেটালি এদের অনেকে আমাদের আত্মীয়... কাছের মানুষ...।

নিজের কলকাতার অভিজ্ঞতার বিষয় একটু একটু করে উজাড় করে দিতে লাগলেন সুদীপা।

রান্নাঘরের টেবিল ছেড়ে ওঠা হয় নি দুই বন্ধুর। বাইরে নরম দিনের আলোয় ভাসছে শান্ত প্রকৃতি। সুদীপার কথা শুনতে শুনতে বোধহয় এতোটাই অবাক এবং বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন বিদিশা যে, টেবিল থেকে প্লেট তুলে নেওয়া কিংবা কফির জল বসাতেও ভুলে গিয়েছিলেন। বোধহয় মাত্র সাতমাস আগে আকস্মিকভাবে রজতাভর মৃত্যু এবং তারপরেই নিজের দেশে সুদীপার দিদি এবং তার পরিবারের আচরণ... সব মিলিয়ে বাস্তবতাটা ঠিক যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছিল না। অসময় নাকি দুঃসময় কি এমনভাবেই ধেয়ে আসে মানুষের জীবনে!

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বিদিশা বললেন, আমার যেন কেমন সব অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে দীপা।

তুমি এদেশে রয়েছো, তাই মনে হচ্ছে। সুদীপা বললেন। দেশে এসব ঘটনা আকছার ঘটছে।

কী জানি বাবা . . . কিন্তু যে অভিজ্ঞতার কথা তুমি শোনালে . . . সত্যি বলতে কি শুনে ভয় ধরে যায়। কিছু জয়েন্ট প্রপার্টি তো আমাদেরও আছে। এদেশে থাকি বলে তো আর দখল নেওয়া হয় না, কিন্তু বিক্রিবাটা হলে হয়তো একটা ফ্ল্যাট কিনতে পারব . . . এসব তো মনে মনে ভাবিই . . .।

সুদীপা বললেন, সব ফ্যামিলিতে যে আমাদের মতন ঘটবে তা তো নয় ! তবে একটা ব্যাপার আমার মনে হয় বিদিশা . . . আমরা এদেশে থাকি বলে অনেকেই চোখ টাটায়। অনেকেই আমাদের ওপর-ওপর স্বাচ্ছন্দ্যটা দেখে। শ্রমের ব্যাপারটা বুঝতে পারে না, কত কিছু একা সামলাতে হয় সে-ব্যাপারে কোনো ধারণা নেই।

আমি তো দেশে গিয়ে দেখি, বিদিশা বললেন, আমার জা - ননদ - বোন কাজিনরা . . . প্রায় সকলেই ড্রাইভার - রাঁধুনি - কাজের লোক সব নিয়ে যা ফূর্তিতে আছে . . . ! তারপরেও ওদের হাজারটা অভিযোগ।

সেটা ছেড়ে দাও . . . যেখানকার যেরকম সিস্টেম। দেশেও ক্রমশ লোকজন পাওয়া, রাখা . . . ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে।

সেটা অবশ্য ঠিক বলেছো ! ঝি - চাকররা অসম্ভব ডিমান্ডিং।

তবে একটা কথা আমার মনে হয় — সময় থাকতে থাকতে প্রপার্টি ইত্যাদির ব্যাপারে একটা ক্লিনকাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যাওয়াটাই ভাল। হচ্ছে-হবে করতে করতে সময় চলে যায়, সংকোচ এসে যায় . . . জটিলতাও বাড়তে পারে।

দুজনের জন্য কফির মগ নিয়ে টেবিলে ফিরে এলেন বিদিশা। বাইরে ফটফটে দিন।

নীরবে কয়েকবার দুজনেই চুমুক দিলেন। তারপর বিদিশা বললেন, তোমার জন্য আমার মাঝেমাঝেই বেশ চিন্তা হয় দীপা। তোমরা আমাকে ভালোবাসো বলেই চিন্তা করো।

আসলে তুমি এখনও বেশ এট্রাক্টিভ দেখতে- শুনতে . . . সেটাও চিন্তার একটা কারণ।

সুদীপা শব্দ করে হাসলেন — একথাটা বেশ ভাল বলেছো — একান্ন বছর বয়েস হল আমার জানো . . . !

যা-ই হোক। যেটা সত্যি তাই বললাম। তুমি যখন কলকাতায় ছিলে, তখন মাঝেমধ্যে এর-ওর-তার বাড়িতেও তোমাদের প্রসঙ্গ উঠতো। অনেকেই তোমার চেহারার প্রশংসা করতো।

আর কিছু না ! আমার বিপদ, ট্রাজেডি নিয়ে কেউ কিছু বলে না !

না - না . . . সে তো বলবেই। ইনফ্যাক্ট রজতদার ইন্সিডেন্ট-এর পরে অনেকে এপার্ট-ও হয়েছে।

চেহারা - শরীর . . . ওপর-ওপর এসব আর কতদিন বলো ! কিন্তু জীবনটা তো তারপরেও চলতে থাকবে . . . তাই না। বটেই তো !

আর অপ্রিয় হলেও একথাটা সত্যি যে একদিন না একদিন যে কোনো একজন আগে চলে যাবে, এবং আর একজনকে একা - একা জীবনযাপন করতে হবে। এর কোনো অলটারনেটিভ নেই।

বিদিশা একটু উদাস মুখ করে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, তোমাকে অন্য একটা কথা জিগ্যেস করছি দীপা . . . এটা অবশ্য পারসোনাল কোয়েশ্চন . . .।

না - না তাতে কী হয়েছে . . . বলো না।

তোমার এবার কী প্ল্যান বলো তো ? কী করবে এবার ?

প্ল্যান বলতে . . . এখানে, নাকি দেশে গিয়ে কী করবো . . . কোনটার কথা বলছো ?

সব মিলিয়েই . . . কী করবে ভাবছো ?

খুব যে কিছু একটা প্ল্যান করে কিছু ভাবছি, তা নয় বিদিশা ।

তাহলেও একা- একা অনেক কিছু তো তোমায় সামলাতে হচ্ছে . . . হবে . . . তাই না ?

হ্যাঁ . . . উপায় তো আর কিছু নেই । কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্ল্যান বলে কিছু করে ওঠার কিংবা ভেবে ওঠারই বা সময় পেলাম কোথায় বলো ! ও চলে যাওয়ার পর থেকে একের পর এক দুর্ভোগ তো যেন ঘাড়ের ওপর এসেই পড়ছে !

বিদিশা মাথা নাড়তে নাড়তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছু বলতে পারলেন না ।

সুদীপা এক ঢোক কফি খেয়ে আবার বললেন, তবে একটা কথা ঠিক, দেশে আমার নিজের দিদি আর ছেলে হোক, কিংবা যে-ই হোক . . . পুরো সমস্ত কিছু ফলস্ দিয়ে, জোচ্চুরি করে, আমার বাড়ি মেরে দেবে আর আমি সব ছেড়েছুড়ে দেব - সেটা কিছুতে পারব না । ওই ফাইটটা আমার করতে হবে ।

কিন্তু করতে গিয়ে এদিকে তোমার যে ক্ষতি হবে . . . ।

আমার জীবনের সব থেকে বড় ক্ষতি তো হয়েই গেছে বিদিশা !

কিন্তু দেশের যেরকম অবস্থা . . . হুলিগ্যানিজ্‌ম, পলিটিক্যাল মস্তানি . . . টাকা খাইয়ে কী না হয় দীপা . . . !

জানি তো ! কিন্তু মানুষ তো বেঁচে রয়েছে তারপরেও ।

সেটা যাদের উপায় নেই . . . তারা আর কী করবে !

কিন্তু উপায় আছে বলেই সব ছ্যাঁচড়ামি - কোরাপশন - চোট্টামি - শয়তানি . . . মেনে নেওয়া যায় . . . বলো ! তাছাড়া এটাও কিন্তু সত্যি যে, টাকা দিয়ে আত্মসম্মান - বিবেক - সাহসিকতা . . . এগুলো কেনা যায় না ।

তুমি তাহলে দেশেই ফিরে যাবে দীপা ? পার্মানেন্ট্‌লি ?

জীবনে পার্মানেন্ট বলে কি কিছু হয় বিদিশা ? তবে কলকাতায় গিয়ে থাকবো . . . সে তো মাথায় আছেই । তারপর দেখি . . . । আমার খুব ওয়ারিজ হয় তোমার জন্য ।

নিজের জন্য আমারও কম ওয়ারিজ নেই বিদিশা . . . কিন্তু মাঝেমাঝে মনে হয় ওটাই আমার চালিকা শক্তি এখন । নিরুদ্দেশ - নিরুত্তাপ - চিন্তাহীন মানসিক অবস্থায় যেন ড্রাইভিং ফোর্সটা তৈরি হয় না . . . তাছাড়া পরোয়াটাই বা কিসের জন্য বলো তো !

কেন দীপা . . . রবিন-মুনিয়া-আমরা . . . এবং এদেশেও তোমার যা কিছু আছে . . . এসব কি পরোয়া করার মতো কিছুই না !

সুদীপা সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিলেন না । নিঃশব্দে কফির শেষটুকু পান করলেন ।

একটু পরে ধীরেসুস্থে বললেন, এগুলো কোনোটাই ফেলনা নয় বিদিশা . . . আমরা সাধারণ মানুষরা তো ওইসব নিয়েই

বাঁচি, বেঁচে থাকি। কিন্তু একটা বড় ধাক্কা এসে লাগলে . . . । কথাটা শেষ না করে থেমে গেলেন সুদীপা। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার বললেন, নিজেই টের পাই, বিগত সাত-আটমাসে আমি অনেকটা না - হলেও, বেশ খানিকটা পালটে গেছি।

বিদিশা অপলক দৃষ্টিতে, বাইরের দিকে মুখ ফেরানো বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ও কি সত্যি খানিকটা পালটেছে! হয়তো সুদীপাই আবার কিছু বলতেন, কিন্তু ফোন বেজে উঠলো তার আগে।

বিদিশা ধরার জন্য উঠতে গিয়েও বললেন, তুমিই ধরো দীপা . . . মনে হচ্ছে মুনিয়াই আবার ফোন করেছে।

হ্যান্ডসেট তুলে নিলেন সুদীপা। মেয়ের গলা শুনেই চিনতে পারলেন। বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা নাড়লেন কথা বলতে বলতে।

(১২)

সৌমেন দত্ত সোফায় বসতে বসতে বললেন, তোমাকে এখন অনেক প্র্যাক্টিক্যালি ভাবতে হবে দীপা।

সুদীপা বললেন, 'এখন' বলছেন কেন সৌমেনদা! রজতাভ চলে যাওয়ার পর থেকেই আমি সেই চেষ্টা করে যাচ্ছি। সে আমি মানছি। ব্যাপারটা সহজ নয় মোটেও, তাও বুঝি।

ছোট্ট রেড ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে সুদীপা বললেন, তাহলে আবার নতুন করে কী ভাববার কথা বলছেন?

নতুন করে মানে . . .. যা বললাম আর কী . . . প্র্যাক্টিক্যাল হতে হবে।

একটা চেয়ার দখল করে বসতে বসতে সুদীপা বললেন, আপনাদের মতো দু-তিনজনের কাছে আমার তো খুব একটা কিছু গোপন করার নেই . . . ও বেঁচে থাকার সময়েও ছিল না। আপনার কি মনে হয় না, এখন আমি অনেকটা স্টেব্‌ল!

সৌমেন মাথা নেড়ে বললেন, না-না স্টেবল তো বটেই . . . তাহলেও বলব . . . তোমার . . . মানে ইফ য্যু ডোন্ট মাইন্ড . . . ।

আপনি এতো সংকোচ করছেন কেন সৌমেনদা! আপনার কাছ থেকে কিছু এ্যাডভাইস নেব বলেই তো বিশেষ করে আজ আসা। টেলিফোনে এসব কথা হয় না। আপনার কি মনে হচ্ছে আমি এখন ও খুব ইমোশনালি কিছু ভাবছি?

হুইস্কির গ্লাসে ঠোঁট ছুঁইয়ে সৌমেন হালকা হেসে বললেন, তার চেয়ে কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলা যায় . . . তোমাকে বোধহয় আরও প্র্যাক্টিক্যাল হতে হবে . . . । মানে . . . রিয়্যালিটি কে ইম্পর্টান্স দিতে হবে। কোন কোন বিষয়ে বলুন?

আলাদা করে আর কী বলব! তুমি নিজেও নিজের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন আমি জানি। তাহলেও বিশেষ করে তোমার টাকা-গয়না, প্রপার্টি . . . তার ডিসট্রিবিউশন . . . এসব নিয়ে সেদিন যা বলছিলে, শুনে মনে হচ্ছিল, তুমি কিছু কিছু ইমোশোনাল ডিসিশন নিতে চলেছো।

সুদীপা মাথা নাড়লেন। — হ্যাঁ সৌমেনদা . . . আপনাকে বলেছিলাম বটে। কিন্তু পরে নিজেও ভেবে মনে হয়েছে, আরও সময় নেওয়ার দরকার — কিছু একটা ফাইনাল করার আগে। আসলে আমি তো কখনও একা একা টাকাপয়সা হ্যান্ডেল করি নি!

সৌমেন বললেন, এখন তারপর . . . এ্যামাউন্টও নেহাৎ কম না।

হ্যাঁ সৌমেনদা। আমার কারেন্ট এ্যাকাউন্টেই তো অনেকটা পড়ে আছে . . . ।

এবং তার প্রায় কিছুই ইন্টারেস্ট নেই রানির দেশে . . . সুতরাং তুমি ইন্ডিয়াতে ইনভেস্ট করার প্ল্যান ভেবেছো। ভেবেছিলাম। ধরুণ প্রায় দেড়শ হাজার পাউন্ড আমার এখানকার ব্যাংকে রয়েছে। মানে . . . প্রায় দেড় কোটি . . . ।

আমিও মোটামুটি সেইরকম আন্দাজ করছিলাম। এবং এটাও ঠিক ওই টাকা ইন্ডিয়ায় ফিক্সড ডিপোজিট-এ রেখে দিলে তুমি যা ইন্টারেস্ট পাবে, তাতেই হেসেখেলে তোমার জীবন কেটে যাবে . . .।

কিন্তু তারও তো আবার ইনকাম ট্যাক্স্ দিতে হবে . . .।

শুধু তাই না দীপা . . . আরও অনেককিছু ভাববার আছে . . .। কিন্তু অমন খাপছাড়া ভাবে এসব আলোচনা করা যায় না . . . দাঁড়াও ওঘরে সবাইকে একবার দেখে আসি . . . তারপর আমার মতামত তোমায় জানাই . . .।

হার্টলেপুল-এর কম্যুনিটি প্র্যাক্টিশনার সৌমেন দত্ত। স্ত্রী জয়া-সহ দুজনেই অনেকদিনের বন্ধু সুদীপা-রজতাভর। বৈষয়িক ব্যাপারে সৌমেন যে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ বন্ধুমহলে সকলেরই তা জানা। সুদীপাও জানেন, কাছেপিঠের স্বচ্ছল বঙ্গসন্তানরা অনেকেই সৌমেন দত্তর কাছ থেকে অর্থ-বিনিয়োগের ব্যাপারে উপদেশ নিয়ে থাকেন।

যথারীতি আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ার পর থেকে সপ্তাহান্তে আবার এবাড়ি-ওবাড়ি যাতায়াতও শুরু হয়েছে। সুদীপাদের সান্ডারল্যান্ড থেকে হার্টলেপুল দূরে নয় — পঁচিশ মাইলের মধ্যে। বিদিশা-সুনন্দনের সঙ্গে সুদীপাও আজ নিমন্ত্রিত সৌমেন-জয়ার বাড়িতে। উপলক্ষ্য কিছু নেই। মে-মাসের বসন্ত কালীন সুন্দর আবহাওয়ার আড্ডা — সেটাই উপলক্ষ্য। কাছেপিঠের আরও পাঁচ-ছটি বন্ধু জড়ো হয়েছেন সস্ত্রীক। সুদীপা এসেছেন বিদিশাদের সঙ্গে, ওদের গাড়িতেই।

কম্যুনিটি প্র্যাক্টিশনার তথা সিপি-দের অর্থনৈতিক অবস্থা এখনও অপেক্ষাকৃত ভালই বলা উচিত, যদিও, হাসপাতালের চিকিৎসকদের তুলনায় তাঁদের শ্রম অনেক বেশি। সৌমেন দত্ত সিনিয়ার প্র্যাক্টিশনার, তাঁর খোলামেলা বড় বাড়ি, বাগান-গ্যারাজ . . . সবকিছুই তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বৈভবের সাক্ষ্য বহন করে। বন্ধুবৎসল হিসাবেও জয়া-সৌমেন পরিচিত। বসার ঘরে অন্যান্য বন্ধুদের আরও একবার দেখভাল করে। বাগানের দিকে কনজারভেটারিতে ফিরে এলেন সৌমেন। একসময়ের খেলোয়াড় মানুষ, ষাট বছর বয়সে এখনও তিনি সজীব মধ্যবয়সী যুবক।

সময়ের হিসাবে সাতটা বেজে গেলেও, দিনের আলোয় ভাসছে চরাচর। সৌমেনের বাড়ির তথাকথিত ব্যাকগার্ডেন এখন ফুলে-ফুলে ছয়লাপ। গোলাপ-টিউলিপ-ম্যাগনোলিয়া ছাড়াও আলো করে আছে চেরিব্লসম। বাগানের ছাঁটা সবুজ ঘাসের ওপর চেরির গোলাপি রঙের পাপড়ির প্রায় মোজাইকের ডিজাইন হয়ে গেছে পুরো লন জুড়ে।

সৌমেনকে ফিরে আসতে দেখে, নিজের গ্লাসে আরও একটু রেড ওয়াইন ঢেলে বন্ধুমহল থেকে সরে এলেন সুদীপা। আড্ডায় যোগ দিতে এলেও, তাঁর পরিস্থিতি অন্যদের থেকে আলাদা। দুমাস হয়ে গেছে কলকাতা থেকে ফিরেছেন। কিন্তু যেরকম অগোছালো অবস্থায় সব রেখে এসেছেন, তাইতে উদ্বেগ তাঁর নিত্যসঙ্গী। হয়তো কোনোভাবে ঠেকা দেওয়া রয়েছে . . . কিন্তু তার পূর্ণ ছবি খুবই অস্বচ্ছ সুদীপার কাছে। উদ্বেগও সেই কারণে। মাইতি এবং অপূর্বরঞ্জন অনিয়মিত যোগাযোগ রাখেন বটে, কিন্তু অতিরিক্ত অনুভবে সুদীপা টের পান, তাঁর অনুপস্থিতিতে ওদিকে কাজ কিছুই এগুচ্ছে না। কিন্তু না এগোলেও, স্থিতাবস্থাই কি থাকছে, নাকি সুযোগসন্ধানীরা দাঁও মেরে দিচ্ছে সেই ফাঁকে।

অথচ এদেশেও সব মিলিয়ে যে পরিস্থিতি, ছেড়েছুড়ে এখনই যাওয়াও তো সম্ভব না। সময় লাগবে আরও। ভেবেছিলেন ছেলেমেয়ের কথা খুব বেশি ভাববেন না। কিন্তু একেবারে ছেড়েও কি দিতে পারছেন! বিশেষ করে মুনিয়ার জন্য কোথায় যেন একটু দুশ্চিন্তাই কালো মেঘের কুন্ডলীর মতো পাকিয়ে উঠছে। রবিন হয়তো কোনো একটা বড় সিদ্ধান্তের দিকে এগুতে চাইছে, কিন্তু তারজন্য আবার অর্থনৈতিক দিক থেকে ও মা-এর সাহায্যপ্রার্থী। সুদীপার হাতে যে এখন যথেষ্ট টাকাপয়সা এসেছে বাবার মৃত্যু পরবর্তী বেনিফিট হিসাবে-রবিনের তা না জানার কোনো কারণ নেই। কী করবেন সুদীপা!

তবু এ দেশটায় একটা মানসিক অবলম্বন আছে যে জোর কে কেউ কিছু কেড়ে নিতে পারবে না। দেশের মতো, আইন এবং আইনের ধারক-বাহকদের মতো ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ইচ্ছেমতো মস্তানরা আইন কিনে নিতে পারবে না। কিন্তু মাথা খাটাতে হবে। একাকীত্বকে মেনে নিতে হবে। চেনা-জানা এবং বন্ধুবান্ধব যতই থাক, ক'দিনই বা আর তাদের সঙ্গে

দেখাসাক্ষাৎ হয় ! তাছাড়া সবাই কাজে ব্যস্ত । জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় এখন । পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর বয়সে সংসার-পরিবারকে আর একবার নতুন করে গুছিয়ে নেওয়ার দরকার হয় । সুদীপাদের অধিকাংশ এদেশের বন্ধুদের এখন সেই পর্ব চলছে । হয়তো ওদেরও চলতো । কিন্তু পরিস্থিতি বদলে গেল ।

সুদীপার জন্য অনুকম্পাবশত কেউ কেউ এখনও কিছু অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করছেন । সময়-উপদেশ দিচ্ছেন । কিন্তু অন্যের সাহায্যে-সমর্থন-অনুকম্পার ওপর নির্ভর করে জীবন কাটে না । হুট বলতে কাউকে ধরার প্রয়োজন হলে, এদেশে কেউ-ই কাজকর্ম সব ছেড়েছুড়ে এসে দাঁড়াতে পারবে না । দূরত্ব এবং আবহাওয়া কেও যথেষ্ট মান্যতা দিতে হয় । এমনকী ছেলেমেয়েকেও প্রয়োজনে কাছে পাবেন না, সেটাই ধরে নিতে হবে । সুযোগ-সুবিধে থাকলেও, নিঃসঙ্গতা এবং একাকীত্ব সম্বল করে করে বাঁচতে হবে । দেশে তথা কলকাতায় এই নির্জন-নিঃসঙ্গ শূন্যতা অনুভবের সুযোগ এখনও কম ।

তথাকথিত সামাজিক এবং সরকারি সহযোগিতার ওপর যদি নির্ভর করতে না হয়, এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান যদি থাকে, সেক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত জীবনযাপন এখনও প্রাণময় এই শহরে । স্বচ্ছল কলকাতার অনেকটাই তো আসলে বৃদ্ধাশ্রম । এই অভিজ্ঞতা আহরণের জন্য সুদীপাকে কোনো অতিরিক্ত উদ্যোগ নিতে হয় নি । তা জারিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই । সুতরাং রজতাভর আকস্মিক মৃত্যুর পরে আবার পুরোন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের কাছে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তই কি সঠিক নয় ! প্রায় ঠিকই ছিল সবকিছু । এখনও নেই তা নয় ।

কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বাড়ির সমস্যাটা ঘাড়ে এসে পড়ার পরেই সুদীপা বোঝেন, টানাপোড়েনটা শুরু হয়েছে নিজের মধ্যেই আসলে ।

একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কার তরঙ্গ টালমাটাল করে দিয়েছে তাঁর ভাবনা আর সিদ্ধান্তকে ।

বহু বছরের দেশীয় সংস্কৃতি ও মূল্য বোধ জনিত অনভিজ্ঞতা যেন হঠাৎই চ্যালেঞ্জের মতো একটি বিস্মিত প্রশ্নবোধক চিহ্ন-স্বরূপ উদয় হয়েছে সুদীপার মনশ্চক্ষে । বিগত চব্বিশ-পঁচিশ বছরে ওপর-ওপর কিছু চাকচিক্যের তলায়, আরও যে কত অন্ধকার জমা হয়েছে ঘরে, বাইরে, বিদেশে জীবনযাপন করে এবং কয়েক সপ্তাহের জন্য ছুটি কাটাতে এসে তার খুব সামান্যই ধরতে পেরেছেন প্রবাসীরা । বোধহয় নিয়মিত জীবনযাপন না করলে ওসব ধরা যায় না ।

এখনই অবশ্য মূল সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন নি সুদীপা । কিন্তু মনে একটি সন্দেহের অনুপ্রবেশ ঘটেছে ।

এদিকে এদেশে ভাল আবহাওয়া বোঝা খুবই দুরূহ যে অন্য সময়ে এ দেশের আঁধারে ডোবা নিঃসঙ্গ শূন্যতার মানসিক চাপ কতখানি । যখন শব্দহীন শৈত্যপ্রাবাহে আঁধারে মলিন প্রকৃতি ডুবে যায়, বৈধব্যের সাদায় ঢেকে যায় . . . ।

কাঁচে ঢাকা কনজারভেটারিতে ঢুকতেই সৌমেনের কথায় চমক ভাঙ্গল সুদীপার ।

তুমি আমায় একটা কথা বলো তো দীপা . . . ।

এটুকু বলেই থেমে গেলেন সৌমেন । উলটো দিকের একটা কৌচে বসতে বসতে সুদীপা বললেন, কী হল সৌমেনদা . . . থেমে গেলেন যে ! হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিলেন সৌমেন । তারপর একটু হেসে বললেন, না . . . হু, তোমার ব্যক্তিগত ভাবনাচিন্তা, ডিসিশনের ব্যাপারে আমার নাকগলানো ঠিক নয় ।

সুদীপার কাঁধ ছাপানো শ্যাম্পু করা চুল খোলা । আজ হালকা সবুজ রঙের শাড়ি-জামার সঙ্গে একটু মানানসই রূপটান । অনেকদিন পরে আবহাওয়ার মতোই যেন কিছুটা ঝরঝরে সাজে বেরিয়েছেন আজ । চুল সমেত ঘাড়ে একটা ঝটকা দিয়ে বললেন, এতো মহা জ্বালা হল দেখছি . . . । সামনের টেবিলের ওপর ওয়াইনের গ্লাসটা রেখে দিয়ে আবার বললেন, শুনুন সৌমেনদা . . . আপনাদের বন্ধু চলে যাওয়ার পরে, বিগত আট-ন মাসে আমার জীবনে এমন কোনও গোপনীয়তা তৈরী হয়নি . . . যাকে ‘একান্ত ব্যক্তিগত’ বলে আপনাদের কাছ থেকে সরিয়ে রাখার দরকার ।

সৌমেন বললেন, আচ্ছা বেশ। হলে জানিও।

ঠিক আছে জানাব। এবার আপনি একটা একটা করে কিছু এ্যাডভাইস দিন তো!

হ্যাঁ . . . সেই দেওয়ার প্রসঙ্গে মনে হল . . . তুমি আসলে ঠিক কী চাও বলো তো?

সুদীপা খুব দ্রুত প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারবেন না। দিতে গিয়েই টের পেলেন, একটা কিছু নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তো তাঁর নেই। ভাসা ভাসা কিছু ধারণার ওপর নির্ভর করে তিনি একটা জীবনের অস্বচ্ছ ছবি দেখেন প্রায়ই। সেই ছবিতে তাঁর অতীত আছে, নস্টালজিয়া আছে। একটা কাল্পনিক নিরাপত্তাবোধের প্রত্যাশা আছে। আর একমাত্র দেশে ফিরে যাওয়ার মধ্যেই যেন তাঁর সেই অস্বচ্ছ ছবির খানিকটা প্রতিফলন দেখতে পান। কিন্তু গতবার দেশে যাওয়ার অভিজ্ঞতা যেন, সেই ছবিটারও কিছু ক্ষতি করেছে আবার।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, সৌমেনদা . . . নিশ্চিতভাবে সেটা যদি জানতাম . . . তাহলে আজকে আমার জীবনের যে টারময়েল, সেটা অন্তত খানিকটা কাটিয়ে উঠতেও পারতাম।

অর্থাৎ এখনও তোমার জীবন এবং যাপন সবকিছুতেই নানান কমপ্লিকেশন . . . তাই না?

হ্যাঁ সৌমেনদা। মাঝেমাঝে কাটিয়ে ওঠার জন্য একটা সিদ্ধান্তর দিকে ঝুঁকে পড়ি . . . আবার ভাবি সেটাই সব থেকে স্বাভাবিক দীপা। এমনিতেও সাংসারিক জীবনে সবসময়ই একটা পাল্লার ওঠানামা চলে। দুটো লোক থাকলে তার মধ্যে ব্যালান্স্ রাখাটা সহজ হয়। রজত চলে গিয়ে, সেখানটায় তোমাকে বেশি অসুবিধেয় ফেলেছে। কিছু করার নেই। সুদীপা নিরুত্তর হয়ে রইলেন।

সৌমেন দু-এক মুহূর্ত পরেই বললেন, কিন্তু আমি তোমায় বলছি দীপা . . . যেখানে অন্য কোনো উপায় নেই, সেখানে চেষ্টা করেও কিছু পজিটিভ এ্যাটিচ্যুড তৈরি করতে পারতে ভাল। কেননা তাছাড়া জীবনটাকে চালানো অসম্ভব।

সুদীপা এবারও মাথা নাড়তে নাড়তে চুপ করে রইলেন।

সৌমেন বললেন, মৃত্যু একটা অবশ্যাম্ভাবী ঘটনা। কিন্তু অসময়ে ঘটলে তা আমাদের বিভ্রান্ত, অসহায় করে দেয় অনেক বেশি। তোমার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। কিন্তু একটা জিনিস প্র্যাক্টিক্যালি ভাবো — রজত মারা গেলেও, ও কিন্তু তোমাকে মেরে যায় নি। হ্যাঁ নিঃসঙ্গতা-শোক-একাকীত্ব . . . কোনোটাকেই ছোট করে দেখছি না, এবং কোনো কিছুই এসবের বিকল্প না। তাসত্ত্বেও তোমায় ভাবতে হবে — আর্থিক দিক থেকে তুমি যে অবলম্বন পেয়েছো, সেটা মূল্যহীন নয়।

সুদীপা মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ সৌমেনদা . . . সেটা আমি অস্বীকার করি না।

ওটাকেই আমি পজিটিভ এ্যাটিচ্যুড বলব দীপা। সৌমেন বললেন। বিশেষ করে এদেশে বলেই . . . অর্থের জন্য অনর্থ, সেই আশংকা না করলেও চলবে তোমার। দরকার হচ্ছে ঠিক ঠিক প্ল্যানিং। তারপর তুমি যেদেশে যেখানেই থাকো . . .।

এক সিপ্ ওয়াইন গলাধঃকরণ করে সুদীপা বললেন, আপনি এবার ওই প্ল্যানিং-এর ব্যাপারেই আমাকে বলুন। ওটার কিছু ব্যবস্থা না করতে পারলে, অন্যদিকেও মন দিতে পারছি না।

বটেই তো। টাকাপয়সার সুষ্ঠ আয়োজন না হলেই বিভিন্ন দিক থেকে ওয়ারিজ। গ্লাসে চুমুক দিয়ে সৌমেন আবার বললেন, তুমি তো জানো দীপা, ইংল্যান্ডে ব্যাংকে টাকা ফেলে রেখে, ফিক্সড্ ডিপোজিট করে . . . কোনোটাতেই বিশেষ লাভ নেই। সেইজন্য প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করা হচ্ছে সব থেকে ভাল।

তার মানে বাড়ি কেনার কথা বলছেন!

সংক্ষেপে সেরকমই . . . তবে তার পেছনে অনেক ভাবনাচিন্তা, ক্যালকুলেশন আছে। আবার তাছাড়াও উপায় আছে। অনেকেই বিভিন্ন ধরনের শেয়ার কিনে টাকা ইনভেস্ট করে। কিন্তু সেখানেও . . .

সুদীপা মাঝখানেই বাধা দিয়ে বললেন, না সৌমেনদা . . . ওই শেয়ার মার্কেটের ব্যাপারে আমি যাব না। ওসব আমার দ্বারা হবে না।

সেটা তোমার অভিরুচি। কিন্তু ইনভেস্টমেন্টের যে কোনো পন্থাতেই মাথা খাটাতে হবে। সময় দিতে হবে।

আপনি আমাকে ওই বাড়ি কেনার ব্যাপারেই কিছু এ্যাডভাইস দিন।

সৌমেন মাথা নেড়ে বললেন, শুধু বাড়ি কিনলেই তো হবে না . . . তারপর সেগুলো ভাড়া দিতে হবে। তার পেছনেও অনেক ভাবনা আছে . . . ডাইরেক্ট ভাড়া দেবে, নাকি এজেন্টের থ্রু দিয়ে দেবে . . . সেখানেও আবার ক্যালকুলেশন আছে। ভাড়ার টাকার হিসেব রাখতে হবে নিয়মিত, বাড়ির মেনটেনান্স খরচ ইত্যাদি বাদ দিয়ে যা তোমার প্রফিট হবে, তার ওপর আবার হিসেব করে ইনকাম ট্যাক্স্ দিতে হবে . . . এসবের জন্য একজন এ্যাকাউন্ট্যান্ট্ -এর পরামর্শ নিতে হবে। নিয়মিত মর্টগেজও দিতে হবে . . . ব্যাংক এবং কাউন্সিল এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে . . .।

আপনার কি মনে হয় আমি এতো সব পারব সৌমেন দা !

না-পারার কিছু নেই। করতে-করতেই অনেককিছু সড়গড় হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ . . . তুমি যদি ইন্ডিয়ায় গিয়ে থাকার কথা ভাবো . . . সেক্ষেত্রে এজেন্টের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। তাহলেও আজকাল ইন্টারনেটে অনেক কিছু করা সম্ভব . . .।

এ ব্যাপারে আমি যদি রবিন আর মুনিয়াকে দায়িত্ব দিই, কেমন হয় সৌমেনদা ?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সৌমেন বললেন, ভাবতে হবে। তা বলছেন কেন ?

কেননা . . . শুধু এদেশে বলে নয়, যে কোনো কোনো দেশেই . . . টাকাপয়সা আয়োজন সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা ছেলেমেয়ের সঙ্গে করে না। করলেও তা নেহাৎ ওপর-ওপর। আমি মনে করি করাটা উচিতও না, কেননা তাইতে সম্পর্ক জটিল হতে পারে।

কিন্তু সৌমেনদা . . . আমার বা আমাদের যা কিছু . . . আলটিমেটলি সে সব তো ছেলেমেয়েরই . . . ওরাই তো সব পাবে। তা পেতেই পারে। কিন্তু তারজন্য আগাম বিলিবন্টনের আলোচনা ইত্যাদিতে ওদের ইনভলভ, না-করাই ভাল বলে আমি মনে করি। আমার এটাও মনে হয়, পৈতৃক সম্পত্তি, অর্থ ইত্যাদির আলোচনায় ছেলেমেয়ের নিজের পায়ে দাঁড়ানর আগ্রহ ক্ষুন্ন হয়।

সুদীপা মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ এই যুক্তিটা তিনি সমর্থন করেন। একটু পরে বললেন, আচ্ছা সৌমেনদা, আমার কাছে যদি টাকা থাকে এবং ছেলেমেয়েরা স্বাবলম্বী হলেও যদি অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে আমার কি ওদের দেওয়া উচিৎ না ?

শোনো দীপা . . . এসব ব্যাপারগুলো ঠিক অন্য কারুর সঙ্গে আলোচনা করার বিষয় বলে আমার মনে হয় না।

সুদীপা বললেন, তা হতে পারে . . . কিন্তু আমি আপনাকে ততখানি ''অন্যকেউ'' বলে ভাবছি না . . . সেইজন্যই . . .।

সৌমেন মাথা দুলিয়ে, একটু হুইস্কি খেয়ে বললেন, থ্যাঙ্কয়্যু। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, আসলে কী জানো দীপা . . . এই সব ব্যাপারগুলোই নির্ভর করে, ছেলে অথবা মেয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের গভীরতা, ঘনিষ্ঠতা . . . তাদের

জীবনযাপন, রোজগার, মেলামেশা, ভবিষ্যৎ চিন্তা ইত্যাদি নিয়ে তোমার কতখানি ধারণা . . . তার ওপর । এবং অবশ্যই তোমার দিতে পারার ক্ষমতা কতখানি প্রয়োজনে তা তো ভেবে দেখতেই হবে ।

তাহলেও আপনি আমাকে একটা জেনরালাইজড আইডিয়া দিন । আমার জানা দরকার ।

সৌমেন একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আমি নিজের দিক থেকে তোমায় একটা উদাহরণ দিতে পারি । তুমি তো জানো, রাজা, আমার ছেলে লন্ডনে থাকে । ও ডাক্তারি পাশ করার পরে স্বাভাবিকভাবেই আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত । ও এখন দায়িত্ব নিজে নিতে সক্ষম এবং আমার আর ওর জন্য মাসে মাসে টাকা খরচের দরকার নেই । কিন্তু বছর দুয়েক পরে ও যখন ওদিকেই সেটল্ করার জন্য একটা বাড়ি কিনতে চাইল, আমি ওকে ত্রিশ হাজার পাউন্ড গিফ্ট হিসেবে দিয়েছিলাম ।

সুদীপা বললেন, তার মানে রাজার তখনকার লাইফস্টাইল সম্পর্কে আপনি সব জানতেন ?

মোটামুটি . . . হ্যাঁ . . . বেশ খানিকটা ধারণা ছিল । ওই টাকাটা দেওয়াতে ওর মাসে মাসে মর্টগেজের পরিমাণ খানিকটা কমে গেল, এবং কম্ফর্টেবলি থাকার জন্য নিজের একটা বাড়িও হয়ে গেল । আমি যেটুকু করতে পারলাম — করলাম । কিন্তু কোনো ডাইরেক্ট রেসপনসিবিলিটি নেই . . . কোনো তরফে ওবলিগেশন ও রইল না । . . .

সৌমেন দত্তর সঙ্গে আরও প্রায় মিনিট কুড়ি একান্তে কিছু বৈষয়িক আলোচনার শেষে, সুদীপার মনে হল তিনি অবশ্যই কিছুটা উপকৃত হয়েছেন । একটু হালকাও বোধ করছেন । টের পাচ্ছিলেন লাউঞ্জ এবং ডাইনিং রুমের দিক থেকে চিরাচরিত আড্ডার হাসাহাসি, গানের কলি ভেসে আসছে । একই সঙ্গে সুখাদ্যের সুগন্ধ উড়ে বেড়াচ্ছে । জয়া নাকি আজ ল্যাম্ব-বিরিয়ানি করেছে ।

অন্যদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সৌমেন ।

ঠিক তখনই কিছু মনে পড়ার মতো বললেন, ও হ্যাঁ . . . একটা কথা তোমায় বলা হল না দীপা । এটা অবশ্য একেবারেই আমার ব্যক্তিগত মতামত । . . . তুমি ইন্ডিয়াতে ফ্ল্যাট কিনে টাকা ইনভেস্ট করার কথা কিংবা ফিক্সড্ ডিপোজিট করার কথা ভেবেছো — বলেছিলে না আমায় ?

সুদীপা বললেন, হ্যাঁ । এদেশে ইন্টারেস্ট নেই . . . রিসেশনের পরে বাড়ির ও দাম পড়ে গেছে . . . সেইসব ভেবেই . . . ।

আমি ওই ব্যাপারটার পক্ষপাতী নই । সৌমেন স্পষ্ট বললেন । যেখানে সোসিও — পোলিটিক্যাল ষ্টেবিলিটি কম, প্যারালাল ইকনমি রান করে উইথ ব্ল্যাকমানি . . . ক্ষমতা দিয়ে ল-অর্ডার ইনফ্লুয়েন্স্ করা যায়, সে আমার নিজের দেশ হলেও, সেখানে টাকা-পয়সা ইনভেস্ট করার আগে আমি দশবার ভাবব । তবে হ্যাঁ . . . নিজে থাকলে অবশ্য পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাবতে হবে ।

আমার তেমন কোনো তাড়াহুড়ো নেই সৌমেনদা । সুদীপা বললেন । ভেবেছি . . . ওই পর্যন্ত । দেশেও আমার ঝামেলা কম নেই . . . ।

সৌমেনের সঙ্গেই সুদীপা উঠে গেলেন অন্য ঘরে বাকিদের সঙ্গে আড্ডায় যোগ দিতে । . . .

ফিরতে যথারীতি একটু বেশি রাত হল । তাহলেও আসন্ন সামারের মধ্যরাত্রিকেও যেন ততখানি নিশুত — নির্জন মনে হয় না । আলো ফুটতে শুরু করে ভোর চারটের আগে থাকতে । সুদীপাকে বার্চভিউ ক্লোজ এর বাড়িতে নামিয়ে দিয়েছেন সুনন্দন — বিদিশা । ইদানীং একা-একা বাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়েই কিছুটা অভ্যস্ত হয়েছেন সুদীপা । রোজকার মতো শুতে যাওয়ার আগে আনসারিং ফোনের মেসেজ চেক করলেন । যথারীতি উইক এন্ড-এ ছেলে-মেয়ের টেলিফোন আসাটা প্রত্যাশিত ।

কিন্তু তৃতীয় মেসেজটা শুনে একইসঙ্গে অবাক এবং সামান্য কৌতুকও বোধ করলেন সুদীপা। মেসেজ রেখেছে, বহুকাল আগেকার যাদবপুর-বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী হিমাদ্রি সেনগুপ্ত . . . হ্যাঁ একেবারে সেই কলেজী ভাষায়। চেহারাটাও মোটামুটি মনে পড়ছে। কিন্তু এখন কী যেন করে হিমাদ্রি ! না, মনে পড়ছে না সুদীপার। ফোন নম্বরই বা পেল কার কাছ থেকে আর একবার শুনলেন মেসেজটা।

. . . ''এ্যাই দীপা . . . কী ব্যাপারটা বল তো তোর ! কলকাতায় এসে একা-একা ঘুরে গেলি . . . একটা বন্ধুর সঙ্গেও যোগাযোগ করলি না ! টেলিফোন নম্বর নেই — ওকথা আমায় শোনাস না। পৃথিবীর যে কোনো কেউ আর একজনের সব খবর জানতে পারে — যদি চায়। আর . . . আমি তো তোর বাড়ির বেশ কাছেই থাকি। আচ্ছা শোন . . . তোর আমাকে মনে আছে তো ? সেই যে কালো লম্বা . . . ফিলজফি অনার্স . . . তোকে প্রেম নিবেদন করে বিবাগী হয়ে গিয়েছিলাম . . . আবার একবার ঝাড় খেয়েই ফিরে এসেছিলাম, কিন্তু তুই তদ্দিনে হাওয়া . . . । কী ভাগ্যিস . . . তা নয়তো . . . আচ্ছা সে যাক। তোর সাম্প্রতিক খবর শুনলাম। . . . এই তো জীবন কালীদা . . . ! কলকাতায় এসে এবার যোগাযোগ না করলে, আমি কিন্তু তোর ফ্লাইট বাতিল করে দিতে পারি। তোর দেশে তো সন্ধে এখন। তাহলে কলকাতায় কত রাত বলতো . . . কোন পাগল এসময় ফোন করে ! হা-হা- হা . . . আসলে আমার দিনরাত সব এক। ভাল থাকিস — যতটা পারা যায়। তুই এলে আরও কয়েকটাকে ডেকে আনবো বাড়িতে . . . আমি হিমাদ্রি . . . এইচ এস জি . . . । বাই দীপা।''

আনসারিং মেশিন অফ করে শুয়ে পড়লেন সুদীপা।

কিছুক্ষণ হিমাদ্রির কণ্ঠস্বর মনে মনে বাজলেও, একটু পরে মুনিয়া আর রবিনের ভাবনাই মনের দখল নিল। কী যে করছে মেয়েটা ! মুনিয়ার মতিগতি পুরোটা বুঝতে পারছেন না সুদীপা। স্ট্যাটিস্টিকস্ অনার্স পাশ করার পরে হঠাৎ কেন ওর ব্যাংক-এ চাকরি করার প্রয়োজন হল কে জানে ! আগে তো ভেবেছিল আমেরিকায়, হার্ভার্ডে যাবে পোস্টগ্র্যাজুয়েট পড়ার জন্য। গেল না। কভোন্ট্রিতে থাকা ইমরান নামের একটা ছেলের কথা দু-একবার সুদীপা শুনেছিলেন মেয়ের মুখে। আর কিছু না। এখন আবার সেই কভোন্ট্রিতেই ওর চাকরি। কোথাও একটা যোগসূত্র নেই তো !

না, সুদীপার কোনও ধর্মীয় গোঁড়ামি নেই। কিন্তু ব্যাপারটা জানার দরকার। ভাসা-ভাসা নয়, বিশদ।

কিন্তু উপায় কী ! কলকাতা থেকে সুদীপা ফেরার পরে মুনিয়া একবারই বাড়ি এসেছিল মা-এর সঙ্গে দেখা করতে। হন্ডা-সিভিক গাড়িটাও তখন নিয়ে গিয়েছিল। মাত্র দু-রাত ছিল। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে খুব একটা কিছুই বলে নি। শুধুমাত্র মা-র কৌতুহলের জবাবে জানিয়েছিল, কোনো বড় ডিসিশন নিলে তুমি ঠিকই জানতে পারবে মা . . . নট টু ওয়ারি।

সুদীপা জিগ্যেস করেছিলেন, তাহলে হঠাৎ তুই চাকরি করতে গেলি কেন ?

পেয়ে গেলাম মা . . . গুড অফার . . . গুড স্যালারি . . . ।

তাহলে তোর হার্ভার্ডে যাওয়ার কী হল ?

এখনও মাথায় আছে। ইটস নট দ্যাট ইজি মা . . . স্কলারশিপ পেতে হবে . . . ।

কভোন্ট্রিতেই তোর সেই একটা মুসলমান বন্ধুর কথা বলেছিলি না ?

কিছুক্ষণ মা-এর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছিল মুনিয়া। তারপর বলেছিল, ইমরান ওয়াজ মাই টিচার ইন ওয়ারউইক য়্যুনিভার্সিটি . . . হ্যাঁ ওর বাড়ি বাকিংহাম-এর কাছেই কভোন্ট্রিতে . . . এ্যান্ড হি ইস ম্যারেড উইথ টু কিডস্ . . . হি ইজ আ গুড ফ্রেন্ড।

মুনিয়া আর কিছু বলেনি, সুদীপাও জিগ্যেস করেন নি। কোথায় যেন একটা খোঁচা থেকেই গিয়েছিল। যতই হোক . . . !

ওদিকে রবিন — ও যেন ইদানীং বারবার নিজের অভাবের ইংগিত দিচ্ছে, সুদীপার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হলেই। লন্ডনেই কোথাও ওর নিজস্ব চেম্বার করতে হবে। একসঙ্গে বাড়ি আর চেম্বার করতে পারলে ভাল হয়। সেক্ষেত্রে আলাদা ভাড়া না দিয়ে একই মর্টগেজ-এ চালানো সম্ভব। কিন্তু তাহলে একটু বড় বাড়ি কিনতে হয়। অথচ লন্ডনে বাড়ির দাম আকাশছোঁয়া। হয়তো মর্টগেজ রবিন চালিয়ে নিতে পারবে, কিন্তু ইনিশিয়াল ক্যাশ-ডাউনের অত টাকা কোথায় পাবে! সেই ট্রোসি ওয়াটসন নামের মেয়েটার সঙ্গে সম্পর্কের পরিণতিটাও ওইসব কারণে থমকে রয়েছে। . . .

ঘুম পুকুরে ডুব দেওয়ার আগেও সুদীপার মাথার মধ্যে নানান ভাবনার জালবোনা চলতেই থাকে।

তারপর কখন তলিয়ে গিয়েছিলেন টের পান নি। একেবারে ঘুম ভাঙ্গল টেলিফোনের আওয়াজে। বাইরে তখন ফটফটে দিন। সব পর্দা টানা থাকলেও যেন . . . একঝাঁক পাখিদের মতো কিছু রদ্দুর . . . হামলে পড়েছে শোওয়ার ঘরে। বিছানার পাশেই রাখা হ্যান্ডসেট তুলে নিলেন সুদীপা। ঘুমভাঙ্গা গলায় বললেন, হ্যালো . . . !

কণ্ঠস্বরে সতর্ক হলেন সুদীপা। — দীপাদি মাইতি বলছি . . . একটা জরুরি দরকারে ফোন করলাম . . . ।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক **নবকুমার বসু** ইংল্যান্ডের বাসিন্দা। ''চিরসখা'' সহ অনেক জনপ্রিয় উপন্যাস তিনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। প্রতিভাস প্রকাশিত 'তোমার আঁধার তোমার আলো' তাঁর নবতম উপহার, গত বইমেলায় প্রকাশিত। 'হটাবাহার' তাঁর প্রথম অন্ লাইন ধারাবাহিক উপন্যাস, তিনি বাতায়নের হাতে তুলে দিয়েছেন।

রম্যরচনা

স্বর্ভানু সান্যাল

গুগল

পর্ব ৬

স্ব বাবু মহারাজ যযাতিকে জিগেস করলেন "মহারাজ, এই যে শুনতে পাই গুগল বলে এক নতুন দেবতার আবির্ভাব হয়েছে। এ দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন?"

মহারাজ যযাতি বললেন – গুগল অতি কার্যকারী দেবতা। এনার দ্বারা নিতান্ত মূর্খও মুহূর্তের মধ্যে জ্ঞানী-গুণী-বিদগ্ধ মানুষে পরিণত হতে পারে, নিদেন পক্ষে নিজেকে জ্ঞানী প্রতিপন্ন করার অভিনয় সফল ভাবে চালিয়ে যেতে পারে। মানে নিজেকে একজন পড়াশুনো করা বিজ্ঞ কেউকেটা দেখানোর ইচ্ছে মাধ্যমিক ফেলেরও থাকে, নোবেলজয়ীরও থাকে। আগে এই জ্ঞান সংগ্রহের ব্যাপারটায় ছিল গোড়ায় গণ্ডগোল। ঠিকমত জানতে হলে লাইব্রেরীতে যাও রে, মোটা মোটা বোরিং বোরিং বই ঘাঁটো রে – যত্তসব গা পিত্তির জালানো ফালতু ঝামেলা। গুগল দেবতার কৃপায় তার আর বালাই নেই। গুগল দেবতাকে পেন্নাম করে একটা প্রশ্ন ঠুকে দিলেই হল। হাতেনাতে উত্তর। ঠিক কতো বছর আগে পৃথিবীর বুকে নিয়ান্ডারথ্যালরা চরে বেড়াত, ডাইনোসরেরা ঘরে ঘরে ডেঙ্গু জ্বরে মারা পড়েছিল না পেটের রোগে, পৃথিবী থেকে প্রতিবেশী নক্ষত্র আলফা সেন্টাউরির দূরত্ব ঠিক কতো কিমি এরকম নানান বিষয়ে instant noodle-এর মত instant জ্ঞান সঞ্চয় করতে, তার থেকেও বড় ব্যাপার সেই সংগৃহীত জ্ঞানাদি immediate কথায় কথায় কায়দা করে ঝেড়ে দিয়ে মোনালিসা হাসি হাসার জন্য গুগল দেবতার সাহায্য অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথের পদবীটা কি ঠিক মনে পড়ছে না, কোই বাত নেহি, গুগল করে নাও। "মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন" না মন্দাক্রান্তা সেন না তানসেন সেটা নিয়ে একটু ধন্দে পড়েছ, গুগল দেবতা আছে তোমার পরিত্রাণে। প্রোগ্রামিং করার চাকরিতে কলুর বলদের মত জুড়ে পড়েছ অথচ পড়েছিলে civil engineering যাতে programming বাদে আর সব কিছু শিখিয়েছে, কিম্বা হয়তো কম্পিউটার engineering-ই পড়েছ কিন্তু বাপের পয়সায় কেনা কম্পিউটারটা একলা রাতে বাজে কাজ করা ছাড়া আর তেমন সদব্যবহার করো নি, programming-এ যাকে বলে ক-অক্ষর-গোমাংস, linked list sort করতে হলে প্যান্টে পেচ্ছাপ করে ফেলার মত দুরবস্থা, প্যান্ট ভিজে যাওয়ার চিন্তা না করে গুগল দেবতাকে স্মরণ করে ফেলো। মুহূর্তের মধ্যে উত্তর। java-য় চাও java-য়, python, অজগর, লুয়া যে ভাষায় চাও লিখে দেবে code টা। তারপর ধরো বাঙালি মাত্রেরই একটু কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে না মাঝে মাঝে? কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছ না। অর্থাৎ কিনা কবি কবি ভাব ভাবের অভাব। সামান্য একটু গুগল করলেই কবিতার যাকে বলে একেবারে কুম্ভ মেলা। পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে কবিতা তোমাকে ছেঁকে ধরবে। সেখান থেকে চেনা কবিদের কিছু অচেনা শব্দ আর অচেনা কবিদের চেনা-যায়-না-এমন শব্দ অর্থাৎ অতি দুর্বোধ্য কিছু শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে নিলেই কেল্লা ফতে। দাঁড়িয়ে গেল তোমার স্বরচিত কিম্বা স্বচয়িত কবিতা (চয়ন থেকে চয়িত কথাটা হয় কিনা গুগল করে একটু দেখে নিও)। এবারে কবিতা খানা facebook-e ঝেড়ে দিয়ে ইচ্ছেমত হাততালি কুড়োও। কবিতাটার কিছু মানে থাকলে সামান্য হাততালি পড়বে, আর না থাকলে সেটা একেবারে "avant-garde" – complete class apart. একেবারে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে।

মহারাজ, এই দেবতার অনুগ্রহ লাভের উপায় কি?

খুবই সহজ। শিব কালি দুর্গা ইত্যাদি mainstream দেবতাদের কলিযুগে অনেক ডেকেও তেমন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। পুরাণ মতে জানা যায় নারায়ণ তো কোন এক কারণ সলিলে যোগ নিদ্রায় নিদ্রিত থাকেন অর্থাৎ সাদা বাংলায় ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোন। গুগল দেবতা একেবারে জাগ্রত। পূজার উপাচার শুধু তোমার মোবাইলে একটা internet

connection. কোনো আলোচনাসভায় কোন্ টপিকে কথা হচ্ছে সেটা আড়ি পেতে শুনে নিয়ে আন্তর্জালের সহায়তায় গুগল দেবতাকে ডেকে ফেলো। এক ডাকেই তিনি প্রদীপের দৈত্যের মত হাজির। টপিকটা চুপিসারে টাইপ করে দিয়ে দু এক পৃষ্ঠা পড়ে নিলেই একেবারে সরস্বতীর বরপুত্রের মত খেলার মাঠে নেমে পড়তে পারবে। পিঁপড়ে নিজের ওজনের ঠিক কত গুণ ওজনের খাবারের টুকরো বইতে পারে, অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু শুঁড়ে বহন করে না ঠ্যাঙে ইত্যাদি তাক লাগানো তথ্য দিয়ে আলোচনারত সমস্ত সুধীবৃন্দকে স্তম্ভিত করে দাও। তথ্যের সত্যতা নিয়ে মাথা ঘামানোর অবশ্য কোন দরকার নেই কারণ আন্তর্জালের তথ্যের মহার্ণব থেকে তথ্যের সত্য মিথ্যা যাচাই করা বোধ করি দেবগণেরও অসাধ্য।

মহারাজ এই দেবতার পূজা-আচ্চার পদ্ধতি কি ? কোন উপাচারে এই দেবতা তুষ্ট ?

ইনি অতি অল্পে তুষ্ট। এনাকে পুজো করার দুটি উপায় শাস্ত্রে বিধৃত আছে। এক উপায়ের কথা আগেই বলেছি। মাঝে মাঝে ওনাকে স্মরণ করে কিছু প্রশ্ন করলেই উনি খুশি হন। উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার প্রশ্নটি বিভিন্ন ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ অ্যাড এজেন্সীর কাছে পাঠিয়ে দেন যারা তোমাদের সেবায় সদাই নিমগ্ন। ধরো তুমি কৌতূহল বশত সিঙ্গাপুরের হোটেলের খোঁজ করতে গুগল দেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছ। তুমি যে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার মতলব ভাঁজছ, এই খবরটা দেবতা সকল ট্রাভেল এজেন্টের কাছে অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেবেন। তারা ক্রমাগত "সস্তা ডীল" ইমেল মারফত পাঠিয়ে তোমাকে "সাহায্য" করার চেষ্টা করবে, তোমার জীবন "সুখে শান্তিতে" ভরিয়ে তোলার চেষ্টা করবে। কিম্বা ধরো তুমি লাক্ষা দ্বীপ থেকে লাক্ষা কিনে এনে বাংলায় চড়া দড়ে বিক্কিরি করে লাখ লাখ টাকা লাভ করতে চেয়ে যদি গুগল দেবতার কৃপা প্রার্থনা করে থাকো, তাহলে তোমার ব্যাবসায়িক সাফল্যকে সুনিশ্চিত করতে গুগলদেব সেই তথ্যটা বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কাছে পৌঁছে দেবেন। তারা তোমাকে ঋণী করার জন্য তোমার ঘরের দরজার সামনে ধর্ণা দেবে। এই উপায়ে দেব-অর্চনাই সবচেয়ে জনপ্রিয়। প্রতি নিয়ত অর্বুদ কোটি লোক এই উপায়েই দেবতাকে প্রসন্ন করছে। এই প্রশ্ন গুলোর দ্বারাই দেবতা জানেন তোমার সমস্ত পছন্দ অপছন্দ, তুমি দিনে কবার পটি করো, চাইনিজ খেতে ভালবাস না ইথিয়োপিয়ান, নেক্সট পুজোর ছুটিতে সমুদ্রে যেতে চাও না পাহাড়ে? Buy one, get one free-এর মত এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার সাথে সাথে তোমার এই চাওয়াপাওয়া গুলোর সামঞ্জস্য বিধানে উপযুক্ত এজেন্টও ধরে দিচ্ছেন অযাচিত ভাবে। একেই বৈষ্ণব ধর্ম মতে বলে "অহৈতুকি কৃপা"।

আর এক ভাবে দেবতার পুজো করা যায়, তা হল তোমার কন্টেন্ট দিয়ে। তুমি অর্থনীতির সমস্ত বই গুটিপোকার মত কেটে ফেলেছ, ডিমানিটাইজেশানে দেশের উন্নতি না অবনতি সে ব্যাপারে তুমি অথরিটি, জনশিক্ষার্থে একটা article লিখে ফেলো এবং সেটি গুগল দেবতার হাতে সঁপে দাও। গুগল তোমার লেখা গুলে খেয়ে নিজের জ্ঞানের পরিধি বাড়াবে এবং অন্য কেউ সেই নিয়ে প্রশ্ন করলে তোমার article টা তাকে উত্তর স্বরূপ ঝেড়ে দেবে। তারপর ধরো তুমি এমন মাথায় মাখার তেল বানিয়েছে যা মাখলে দশাননের দশ মাথা জোড়া সুপ্রশস্ত টাক ঠিক আড়াই দিনেই চুলের মহারণ্যে পরিণত হবে, কিম্বা এমন একটা ফেয়ারনেস ক্রিম বানিয়েছে, যেটা মাখলে ব্লাডি নিগাররাও "খাঁটি আর্য" দের মত ফরসা হয়ে উঠবে ঠিক সাড়ে সাত ঘণ্টায়, গুগলের কাছে তোমার প্রোডাক্ট পোর্টফোলিওটা ভরসা করে দাও। দেখবে বর্ষার জলের মত তোমার প্রোডাক্ট হই হই করে বিকোচ্ছে। এইভাবে যারা গুগল দেবকে নিজের content দিয়ে পূজা করে থাকেন তারা প্রায়শই দেবতার কৃপায় লক্ষ্মী লাভ করে content হন অর্থাৎ কিনা পরিতৃপ্ত হন। দেবতার এইসব অনুচরেরা নিজেদের কন্টেন্ট ফীড করে দেবতার জ্ঞানের পরিধি ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে। তবে শিবের যেমন সহস্র সহস্র ভুত প্রেত অনুচর থাকা স্বত্বেও নন্দী আর ভৃঙ্গি সবচেয়ে বেশি কৃপাধন্য, তেমনি এই অনুচরদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে কৃপাধন্য যাদের কন্টেন্টের অনেক ব্যাকলিঙ্ক আছে। অর্থাৎ তুমি যে পাতায় নিজের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যটি রেখেছ, অন্য কেউ যদি সেই লেখা থেকে হুবহু ঝেড়ে দিয়ে তোমার পাতাটির লিঙ্ক রেফারেন্স স্বরূপ নিজের পাতায় পেশ করে থাকে, তাহলে তুমি লাভ করলে একটি ব্যাকলিঙ্ক। এইভাবে যত ব্যাকলিঙ্ক উপার্জন করতে পারবে ততই তোমার

দেবতার কৃপা দৃষ্টিতে আসার সম্ভাবনা। প্রভূত পরিমাণ ব্যাকলিঙ্কের দ্বারা দেবতার মনোরঞ্জন করতে পারলে চাই কি অন্যদেরকে প্রশ্নের প্রথম উত্তর হিসেবে দেবতা তোমার পাতাটা ধরে দিতে পারেন। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি জিজ্ঞাসু মানুষ তখন তোমার পাতায়, তোমার কন্টেন্টে চোখ বোলাচ্ছে। তোমার এই জনপ্রিয়তা নজর এড়াবে না বিভিন্ন সংগঠনের যারা এই জনতা জনার্দনের সাহায্যে সদা তৎপর। তারা তোমাকে কিছু নজরানা দিয়ে তোমার পাতায় নিজেদের প্রোডাক্টের উৎকর্ষতা সগর্বে ঘোষণা করবে। বিদ্যার দেবী সরস্বতীর অর্চনাও হল জিজ্ঞাসু জনের, সাথে তোমার হল ধনলক্ষ্মীলাভ।

এখন তুমি যদি যথেষ্ট পরিমাণ ব্যাকলিঙ্ক সংগ্রহ করতে না পারো তারও বন্দোবস্ত আছে। শান্তি স্বস্ত্যয়ন করতে হবে। পদ্মলোচন রাম যেমন একশ আটটা পদ্ম দিয়ে দেবীর পূজা করতে চেয়ে একটি পদ্মের অভাবে নিজের পদ্ম আঁখিটি ধরে দিতে চেয়ে দেবীর প্রসন্নতা লাভ করেন, তেমনি ব্যাকলিঙ্কের অভাব তুমি মেটাতে পারো প্রাচিত্তির স্বরূপ গুগলে দেবতাকে কিছু টাকা কি ডলার ধরে দিয়ে। পুজোর সময় ফল-মিষ্টি দিয়ে দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করার সময় যেমন নাম, গোত্র, নক্ষত্র বলতে হয়, ঠিক সেরকমই ঠিক কোন্ প্রশ্নের উত্তরে তোমার পাতাটি দেখাতে হবে সেটা দেবতাকে বলে কিছু মূল্য ধরে দিলেই হাতে হাতে ফল। একদম গুগল সার্চ রেজাল্টের প্রথম পাতায় প্রথম লিঙ্ক হিসেবে তোমার স্থিতি। ফলাফল একই। তোমার প্রোডাক্ট বা কন্টেন্ট হু হু করে বিকোবে।

আহা। দেবতার কি মহিমা! মহারাজ এই দেবতার প্রণাম মন্ত্রটা যদি একটু বলেন। লিখে নাও –

দেহী দেহী, জ্ঞানং দেহী, স্থানং দেহী প্রথম পাতায়

ধনং দেহী, ব্যালেন্স দেহী, আমার স্টেট ব্যাঙ্কের খাতায়।।

নমঃ শ্রী গুগলায় নমঃ

স্বর্ভানু সান্যাল – জন্ম হাওড়ার রামরাজাতলায়। ছাত্রজীবন কেটেছে পুরুলিয়া, হাওড়া ও দুর্গাপুরে। কর্মজীবনে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। চাকরিসূত্রে বিভিন্ন দেশ ঘুরে শেষ নয় বছর আমেরিকার শিকাগোয় কর্মরত। পেশাদারি এবং পারিবারিক জীবন বাদ দিলে, তার অনেকটা সময় কাটে সাহিত্যচর্চা করে। অনুগল্প, রম্যরচনা, কবিতা, স্মৃতিকথা নিয়মিত লিখে থাকেন। ''যযাতির ঝুলি'' (https://jojatirjhuli.net) নামে তার ব্যক্তিগত ব্লগ আছে এবং সেই ব্লগ এর মাধ্যমে তার লেখা নিয়মিত পাঠকদের সাথে ভাগ করে নেন। ব্লগটি বেশ জনপ্রিয় এবং সেটির সাথে লিঙ্কড একটি ফেসবুক পেজও আছে (https://www.facebook.com/jojatirjhuli)। প্রতিটা লেখকের মধ্যেই বাস করে তার লেখার এক চরম ও নির্দয় বিচারক। স্বর্ভানুর বিচারে সে সাহিত্য সাগরের ধারে বসে শুধুমাত্র নুড়িই কুড়িয়েছে। অন্য শখের মধ্যে আছে বেড়ানো, ফটোগ্রাফি, গান শোনা। আর অবশ্যই কারণে অকারণে একটু গড়িয়ে নেওয়া।

পল্লববরন পাল

সনেটগুচ্ছ

সনেট ১২

পালি এসেছিলো প্রস্তর-বৈশাখে
তখনো আগুন হয়নি আবিষ্কৃত
পাথুরে জীবনে অন্ধকার অমৃত
অনুভূতি শুধু বন্য জ্যোৎস্না মাখে
আগুন আসেনি, কাজেই আসেনি ক্রোধ
ছিল হিংস্রতা, চুম্বনহীন ক্ষুধা
অনাবিষ্কৃত নারীর অধরসুধা
গুহাশয্যায় ভালোবাসাহীন বোধ

পালি এলো নিয়ে আগুন আচম্বিতে
সভ্যতা এলো এগিয়ে লক্ষ বছর
আলিঙ্গনের উষ্ণতা এলো শীতে
রাগ-অনুরাগ খোলা বুকে কাটে আঁচড়

পৃথিবীতে ভালোবাসা নিয়ে এলো পালি
শোক-যন্ত্রণা সাজালো গৃহস্থালি

সনেট ১৩

অতিকায় প্রস্তর ছিলাম সে যুগে
রোদে জলে অনুভূতিহীণ এক জড়
ডিপ্লোডোকাসদের চাপে মরোমরো
দিন রাত একাকার নিরেট হুজুগে
উদ্ভিদ হয়ে পালি এলো সে উঠোনে
সবুজ পাতার ছায়া আমার আকাশ
ঢেকে দিলো, ছুঁয়ে দিলো ইচ্ছের ঘাস
আমার রুক্ষ দেহে, দক্ষিণ কোণে
এক শীতরাতে এসে বলেছিলো পালি
‘প্রতীক্ষা করে আছি, ওঠো জাগো প্রাণ’ —
আমার শরীরময় শুভ্র শেফালি
সরিয়ে মেলেছি চোখ-পাপড়ি সটান

মানুষ-জন্ম তুমি দিয়েছিলে পালি
পাথরে রেখেছি লিখে পথের পাঁচালি

কর্মসূত্রে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের মাস্কাট শহরে একটি নামী বহুজাতিক কন্সালটেন্সি কোম্পানির চিফ্ আর্কিটেক্ট, আর মর্মসূত্রে আগাপাশতলা এক বামপন্থী বিষণ্ন কবি — প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫ — যার মধ্যে আছে দুটি উপন্যাস — একটি গদ্য, একটি পদ্যে লেখা। গান, ছবি আঁকা, আর পড়াশোনা — খুব কাছের বন্ধু এই তিনজন।

সঞ্জয় চক্রবর্তী

সহজাত

এবার থেকে তুমিও জেনো
তুমিও পারো সহজ হতে,
এখন তুমি তেমনটা নও
যেমন ছিলে আরম্ভতে,

আর কটা দিন মানিয়ে নিও
একপেশিয় তিক্তস্বাদে,
রোজগেরে দিন সমীকরণ
ক্যালকুলেটিভ বাস্তবাদে,

ধুল ঝেড়ে নাও পোষাকি মন,
নিটোল থাকুক টাইয়ের গিঁটে,
আলতো ছোঁয়া বুলিয়ে নিও
অর্থনীতির ব্যালেন্সশীটে,

মনখারাপের সহজ রাতে
কিন্তু কে আজ জাগিয়ে রাখে?
ঘুমের আগে হাতের মুঠোয়
এক কবিতার বই ই থাকে ।

সঞ্জয় চক্রবর্তী অধুনা সিডনী নিবাসী । পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু নেশায় আদ্যন্ত কবিতাপ্রেমিক । ছন্দ তার কবিতায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে । ফেসবুকিয় জগতে অনেক দিন ধরে টুকিটাকি লেখার পর অবশেষে বাতায়নে আত্মপ্রকাশ । সঞ্জয়ের সব থেকে বড় দুর্বলতা হল মেঘ আর বৃষ্টি ।

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

এই ফড়িঙের বাগানে একাকী এক গাছ

'বাতাসে ফুলের গন্ধ, আর কিসের হাহাকার' – –

পুরনো হাওড়ার এক ধূ ধূ দুপুরে, কাকার টেবিলে পড়েছিল বইটা। হালকা বিবর্ণ হলদে সবুজ জমির ওপর শুকনো রক্তের রঙে পুরনো অক্ষরের ছাঁদে লেখা সমর সেনের কবিতা*। পাতা উল্টে প্রথম পাতায় পেয়েছিলুম –

'স্তব্ধরাত্রে কেন তুমি বাইরে যাও
আকাশে চাঁদ নেই, আকাশ অন্ধকার,
বিশাল অন্ধকারে শুধু একটি তারা কাঁপে
হাওয়ায় কাঁপে শুধু একটি তারা।'

স্বীকার করি, থমকে গিয়েছিলুম। ছন্দ চোখে ধরা দিচ্ছে না। অথচ কবিতাটা আমায় আটকে রাখছে। পরের পাতায় –

'ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি।
বাতাসে ফুলের গন্ধ;
বাতাসে ফুলের গন্ধ,
আর কিসের হাহাকার।'

একই বাক্য পরপর দুবার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমবার সেমিকোলন পরের বার কমা। যতি চিহ্ন শুধু ছন্দ সৃষ্টি করছে না, কবিতার ভাষাকে পাঠকের কাছে নিয়ে আসছে। তার কয়েক পাতা পরেই . . .

'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
রাত্রে ধুসর সমুদ্রে হাহাকার আসে,
ধুসর আকাশ
আমার নিদ্রাহীন অন্ধকারে শুধু যেন শুনি
দুপুরের খর-সূর্য্যে ক্লান্ত মহিষের পদক্ষেপ
ইস্পাতের কঠিন পথে।'

শেষ তিনটি লাইন আমাকে আধুনিক নগর জীবনের মধ্যবিত্ত ব্যর্থ একাকিত্বর সামনে বসিয়ে দিয়েছিল।আমাকে এখনো তাড়া করে – 'খর সূর্য্যের ক্লান্ত মহিষের পদক্ষেপ/ইস্পাতের কঠিন পথে'। আর এইভাবে বিখ্যাত এক কবিতার লাইন একদম অন্য চিন্তায় ব্যবহার সেই প্রথম, অন্তত আমার কাছে।

এ কবিতা গড়গড় করে পড়ার জন্যে নয়। কিন্তু 'দুরূহ' বলে ফেলে রাখা যাবে না। ঠিক প্রেমের কবিতা মনে হয়নি। যেন একটা চাপা যন্ত্রণা, একাকিত্ব। আর সেই একা থাকার নৈ:শব্দপুর্ণ অন্ধকারের কবিতা। আপাত আবেগহীন জীবনের এক গভীর হতাশা আর নি:সঙ্গতার, অনুভূতির কবিতা।

আজ থেকে বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর আগে, তখন আমি নিয়মিত কবিতা পড়তে শুরু করছি। তার রস তার রহস্য, তার আলাদা ভাষাতে আগ্রহ জন্মাতে শুরু করছে। কম বয়সের সবজান্তা ভাবও অল্প এসেছে। সেই সবজান্তা এঁচোড়ে পাকামিকে আটকে দিয়েছিল এই শীর্ণ ১৪২ পাতার সিগনেট প্রেসের বই। আমি মোহগ্রস্তের মত ঢুকতে শুরু করেছিলুম। শেষহীন নির্জন দুপুর, অনেক বিক্ষুব্ধ রাত এই বই আমায় টেনে রেখেছে . . .

. . . কয়েক পাতা পেরুতেই কবির প্রেমের কবিতার মধ্যে ঢুকতে শুরু করি।

'মাঝে মাঝে তোমার চোখে দেখেছি
বাসনার বিষন্ন দু:স্বপ্ন
তার অদৃশ্য অন্ধকার প্রতি মুহূর্তে
আমার রক্ত হানা দেয়।' . . .

কিংবা

'বিষাক্ত সাপের মতো আমার রক্তে
তোমাকে পাবার বাসনা।
আর মাঝে মাঝে আকাশে হলুদ রঙের অদ্ভুত চাঁদ ওঠে,' . . .

কবিতা গভীর প্রেমের। সে প্রেম প্রচন্ড দেহজ এবং সম্পূর্ণ রোমান্টিকতাহীন। নেই প্রেমের আনন্দ, নেই শিহরণ, ব্যাকুল মনোরম রঙিন প্রেমের স্থান নেই এই কবিতায়। এমনকি বিরহ কোনমতেই আবেগমাখা নয়। মধুরতো নয়ই। বাংলাপ্রেমের কবিতায় যে আবেগ, উচ্ছাস প্রগাঢ় মমতা থাকে, তার সচেতন পরিহার। ভাষাও যেন এমন প্রেমের সাথে মিল খাওয়ানো। কাটা কাটা শব্দ দিয়ে তৈরি লাইন।

'বাসনার বিষণ্ন দু:স্বপ্ন' – এ বাক্যবন্ধ বুদ্ধদেব বসু বা বিষ্ণু দের কবিতায় দেখিনি। রবীন্দ্রনাথে আশা করাও অন্যায়। আর 'বিষাক্ত সাপের মতো পাবার বাসনা' – একে ফ্রয়েডিয় বলা যাবে কি? ফ্রয়েডের সেক্সচুয়ালিটি এর থেকে অনেক আপাত রোম্যান্টিক। আমি বুঝতে পারছিলুম এক অজানা জগতের ব্ল্যাক হোলের মাধ্যাকর্ষণে আটকা পড়ে গেছি।

সমর সেন কে তখন মূলত তিরিশ-চল্লিশের নতুন মধ্যবিত্ত সমাজের প্রেমের কবি ভাবতে শুরু করছি। ফ্রয়েডিয় যৌন অতৃপ্তির কবি। তখন আমার চোখ পড়েছিল একদম ভিন্ন কবিতায়। কয়েক পাতা পরেই। বোমা ফাটার মত . . .

'তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো!
কিংবা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে,
হে ক্লান্ত উর্বশী,
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্নমুখে
উর্বর মেয়েরা আসে' . . . (উর্বশী)

এ কবিতা যখন পড়ছি, তখন আমার 'নহ মাতা নহ কন্যা' – পড়া হয়ে গেছে । এবং ধাক্কাটা সামলাতে বেশ সময় লেগেছিল । কয়েক পাতা পরে . . .

‘ম্লান হয়ে এল রুমালে ইভনিংইন-প্যারিসের গন্ধ’
হে শহর হে ধুসর শহর কালীঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে শহর হে ধুসর শহর
লুব্ধ লোকের ভিড়ে যখন তুমি নাচো
দশ টাকায় কেনা কয়েক প্রহরের হে উর্বশী
তখন শাড়ির আর তাড়ির উল্লাসে অমৃতের পুত্রের বুকে চিত্ত আত্মহারা নাচে রক্তধারা
আর দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ ওঠে
হে শহর হে ধূসর শহর।
‘আমি নহি পুরুরবা হে উর্বশী’
মোটরে আর বারে
আর রবিবারে ডায়মন্ডহারবারে
কয়েক টাকার কয়েক প্রহরের আমার প্রেম’, ...

আগেই বলেছি এই ভাবে বিখ্যাত কবির অতি বিখ্যাত কবিতার লাইনকে অন্য অর্থে ব্যবহার আগে আমার সামনে আসেনি। তখনো সেই ২০-২২ বছর বয়সে ইয়েটস, পাউন্ড বা এলিয়ট পড়া হয়নি। স্পেন্সারের কবিতার বিখ্যাত লাইনকে এলিয়ট কিভাবে ব্যবহার করেছেন আমার জানা ছিল না। তার সাথে এই ব্যঙ্গ, তিরস্কার। জ্বলন্ত চাঁদ কি আমাদের বিবেক ? শেষ হতে শুরু হওয়া মধ্যবিত্ত মুল্যবোধ? ওই ছন্দ? বারবার ‘আর’ এর মতো শব্দ দিয়ে কবিতা হয় ? তার ওপর ‘ডায়মন্ডহারবারে’-র মতো শব্দ অন্তে !!

আশাভঙ্গ আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল। রবীন্দ্রনাথকে এমন করে একদম অন্যভাবে ব্যবহার ! আবার ঠিক ডি এল রায় বা শনিবারের চিঠি মার্কা সস্তা কাদা ছোঁড়া নয়। একি কবিতা ? এ ছন্দ আমার পড়ার বাইরে। কখন একদম ছন্দহীন, কখন অক্ষরবৃত্তর সাবেকি পয়ার।

আমি যখন এই ১৪২ পাতার বইয়ের প্রথম চল্লিশ পাতার শ্যাওলা আর গভীর জলের ঝাঁজিতে পা আটকে ডুবে আছি, আমার বাবা মৃদু হেসে বলেছিলেন ‘জানিস কি এই প্রথম পর্বের কবিতা আঠারো থেকে একুশ বছর বয়সের মধ্যে লেখা ?’ বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল।

সেই তখন থেকে সমর সেন নামে মিথকে জানার চেষ্টা, তাঁর নানা লেখা, ওনার ওপরে লেখার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়।

কলেজি পড়ায় তাঁর রেকর্ড নম্বর। সেই ষোল সতের বয়সের ছেলের ইংরেজির ওপর দখল দেখে অনেকেই চমকে উঠে অবাক হয়েছেন। রাধারমন মিত্র থেকে বুদ্ধদেব বসুর মত বিদগ্ধ পন্ডিত, সবাই বারবার উল্লেখ করেছেন। তাঁর ঠার্কুদা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রবাদপ্রতিম মনীষী দীনেশচন্দ্র সেন। বাবা ইতিহাসের নামকরা অধ্যাপক অরুণ সেন। অরুন সেন নাকি ঠাট্টা করে ছাত্রদের কাছে বলতেন ‘আই অ্যাম সন অফ আ গ্রেট প্রফেসর অ্যান্ড ফাদার অফ এ গ্রেট পোয়েট-স্কলার’।

জন্মেছিলেন ১৯১৬ সালে। উত্তর কলকাতার বিশ্বকোষ লেনে, কাঁটাপুকুরে। নিজেকে খাঁটি উত্তর কলকাত্তাইয়া বলতেন। কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন আই.এ পড়াকালীন, ষোল বছর বয়সে। বুদ্ধদেব বসু যখন কবিতা পত্রিকা বার করলেন ১৯৩৫ সালে, তখন সমর সেন সহঃসম্পাদক হয়েছেন।

সেই উনিশ বছর বয়সে 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় লেখেন –

'কেতকীর গন্ধে দুরন্ত
এই অন্ধকার আমাকে কি করে ছোঁবে ?
পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,
আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের সুদূর, নিঃসঙ্গ' ।

এই ছন্দ, এই শব্দ-বন্ধনী, ক্রিয়াপদহীন বাক্য বাংলা কবিতা আগে লেখেনি। তাঁর কবিতার এই কাটা কাটা বাক্যর প্রবল নীরব উপস্থিতি প্রথম বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বুদ্ধদেবকে লেখেন – 'সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এঁর লেখা ট্যাঁকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে'। রবীন্দ্রনাথের এই কথা আমাকে বিস্মিত করে। যে রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে এবং জীবনানন্দকে কবি হিসেবে স্বীকার করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ এই কাটা, ক্রিয়াপদহীন বাক্যছন্দকে কিভাবে স্বীকার করেছিলেন আমি জানিনা। পরে অবশ্য যখন 'আধুনিক বাংলা কবিতা' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হোল, সমর সেন সেখানে স্থান পাননি। এর পরের বছরে, ১৯৩৬ সালে Times literary supplement-এ এডোয়ার্ড টমসন তাঁর কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন ও তাঁর প্রসঙ্গে লেখেন। সেই সময়ে সমর সেন, স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকাতে বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসুর কবিতার সমালোচনা নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। বয়স তখন তাঁর উনিশ।

এই ১৯৩৬সে বি.এ.। দুবছর পরে এম.এ.। দুবারই ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। এর মধ্যে কবিতা পত্রিকা আধুনিক কবিতার পাঠক মহলে স্থায়ী আসন নিয়েছে। এবং তিনি সহসম্পাদক থেকে বুদ্ধদেব বসুর সাথে যুগ্ম সম্পাদক হয়েছেন। সেই বয়সেই। তিনি আচমকা এমন নতুন ধারা এনেছিলেন যে ছাপার অক্ষরে বেরুবার সাথে সাথে শনিবারের চিঠির আক্রমণ পেয়েছেন। আবার ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মত বনেদি বিদগ্ধ সমালোচক থেকে শুরু করে বিষ্ণু দে, সুধীন দত্ত তাঁর কবিতার আলোচনা নানা পত্র পত্রিকায় করতে শুরু করেন। তিনি বামপন্থী শিবিরের কাছের মানুষ হিসেবে নিজেকে ব্যক্ত করতেও শুরু করেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই, 'কয়েকটি কবিতা' বেরোয় ১৯৩৭ সালে। উৎসর্গ করেন মুজফফর আহমেদকে। একটু অবাক লাগে। কারণ মুজফফর আহমেদকে তখন, ঘনিষ্ঠ কমিউনিস্ট মহলের বাইরে খুব কম লোক তাঁকে চিনতেন। বাকি মানুষের কাছে নজরুলের বন্ধু (লাঙ্গল পত্রিকার সহসম্পাদক) হিসেবে গুটি কয়েক মানুষের কাছে শুধু পরিচিত ছিলেন। এই সময়েই স্টিফেন স্পেন্ডারের মত নামী দামী ইংরেজ কবির সঙ্গে সুধীন দত্তের বাড়ির আড্ডায় বাকবিতণ্ডা তর্কে জড়িয়ে পড়েন। স্পেন্ডার তখন তাঁর বন্ধুকবি অডেনের সঙ্গে একসাথে, ঘোষণা করে মার্ক্সবাদকে ত্যাগ করেছেন। তর্কের সূত্রপাত সেখান থেকে (স্পেন্ডার কলকাতায় এসেছিলেন ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রণে)। এই সময় সমর সেন খোলাখুলি রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লেখেন "আপনি সুদূরেই থেকে যাবেন। আমরা আপনার কাছে যেতে পারব না"।

তিরিশের কলকাতা। এই এক সময় যখন বাংলা কবিতা নতুন ভাষা খুঁজছে। নাগরিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভাষা। জোতজমির সঙ্গে সম্পর্কহীন, তিরিশের মন্দা আক্রান্ত, বাবুয়ানি হারানো মধ্যবিত্তের ভাষা।

পৃথিবীর সব ভাষার কবিতার ইতিহাসে এইরকম নতুন রাস্তার মোড় এসেছে। ফরাসী সিম্বলিজম পুরনোকে ফেলে এগিয়ে গেছে। মাইকেল, ঈশর গুপ্তকে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ মাইকেলি মহাকাব্যের দিকে ফিরেও তাকাননি। একইভাবে ব্রিটিশ কবিতা প্রথম যুদ্ধের সময় থেকে ভিক্টোরিয়ান রসেটি, সুইনবার্নকে ঝেড়ে ফেলে ইয়েটস, এজরা পাউন্ড, এলিয়টের সাহিত্যে জীবনের আয়না খুঁজে পেতে শুরু করেছিল। তিরিশের নতুন নাগরিক বাংলাকেও নতুন

কবিতার ভাষা খুঁজতে হয়েছে। তিরিশের মন্দা, বিশের দশকের জমির সঙ্গে সম্পর্কহীন শহুরে মধ্যবিত্তের সমাজের সামনে বেশী করে এগিয়ে আসা। এই সমস্ত পালটে যাওয়া নগর কোলকাতা কবিতাকে নতুন ভাষা, নতুন ছন্দ খুঁজতে তখন বাধ্য করাচ্ছে।

সুধীন দত্তের ভাষায় 'we got to be different'। সামনে উপনিষদ, রোম্যান্টিসিজম, ভিক্টোরিয়ান মুল্যবোধ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ। সেই 'শান্তিনিকেতনের প্রাচীন বনস্পতির' ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তিরিশের কবিরা। জীবনের হতাশা, নতুন সম্পর্ক, তার ওপর ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব।

কবি হিসেবে কখনই সমর সেন পপুলার হননি। এই ঘরানার কবিতায়, আবেগ আক্রান্ত বাংলায় পপুলার হওয়া যায়না। কিন্তু তন্নিষ্ঠ-সিরিয়াস গভীর পাঠক মহলে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন ১৯৩৮ সালের কাছাকাছি সময়ে। এবং এলিয়ট।

সমর সেনকে নিয়ে কোন আলোচনা, এলিয়টকে বাদ দিয়ে করা যাবে না। সমর সেন আবেগকে সংযমের কড়া দড়িতে বেঁধে কবিতার জগতে তুলে এনেছেন। সেই সংযম তাঁকে এলিয়টের বিখ্যাত উক্তি "Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion . . ." এর কাছে নিয়ে গেছিল। বুদ্ধদেব বসুকে চিঠিতে লিখেছেন "আমাদের মত বখাটে জেনারেশনের কবি হলেন এলিয়ট"। অনেক কবিতায় এলিয়টের ছায়া এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। তাঁর 'হে শহর, ধূসর শহর' পড়ে এলিয়টের 'city! o old city!' মনে পড়ে। অথবা 'to luncheon at the cannon street Hotel/Followed by a weekend at the metro pole তাঁর কবিতার 'মোটরে আর বারে/আর রবিবারে ডায়মন্ডহারবারে' . . .। যেভাবে ব্রিটিশ মধ্যবিত্তের মুখোশ নিয়ে এলিয়ট ব্যঙ্গ করেছেন, যে ভাষা ব্যবহার করেছেন বা বলা যেতে পারে ভাষাকে, ছন্দকে তৈরি করেছেন – সমর সেন সেটাকে তিরিশের মধ্যবিত্তের জীবনের আবেগের ছাল ছাড়াতে আদর্শ মনে করেছিলেন। স্বীকারও করেছেন। অন্ত্যমিল মাখা অনুপ্রাশের কলখোলা আবেগের তোড়ের ঢেউ আটকাতে ওই এলিয়টী স্টাইল তাঁর কাছে অনেক নিবিড় ছিল।

এই সময়ের মাঝে সমর সেন নামে মিথকে তখন আমি দেখতে চাইছিলুম। এই মিথ ভাঙ্গার চেষ্টার মাঝে একদিন তাঁকে প্রথম দেখতে পাই। তখন তিনি কবিতার জগত ছেড়েছেন বহুদিন। শশিভূষন দে স্ট্রিটে। মন্টুবাবুর কথাশিল্পের সামনে। একটি ছোটখাটো ফর্সা শীর্নকায় মানুষ। কথা বলছেন দু একটা। সঙ্গে যতদূর মনে হয় গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। খবরের কাগজের পরিচিত মুখ। টিপিক্যাল বাঙালি মধ্যবিত্ত। ডিসপেপসিয়া রুগী। না বইপত্রের মিথের সঙ্গে চোখের দেখা মেলেনি। ইংরেজি সাহিত্যে দুবার ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। স্টিফেন স্পেন্ডারের মত জবরদস্ত কবির সঙ্গে তর্কযুদ্ধে পিছপা হননা – এমন মানুষ তো দীর্ঘাঙ্গী, খড়্গ নাসা, গৌরবর্ণ হবেন। হয় স্যুট, নয় বিষ্ণুপুরী কালোপাড় ধূতির কোঁচা দোলানো পাক্কা ভদ্রলোক হবেন। মেধা আর প্রতিভার জ্যোতির্বলয় ব্যক্তির পরিচয় দেবে। আর আমার সামনে খর্বকায় সাধারণ প্যান্ট সার্ট পরা অতিপরিচিত বাঙালির প্রোফাইল। মেলেনি। মানসিক স্তরে মিথকে যেভাবে তৈরি করেছিলুম, তার সঙ্গে মেলেনি।

মিথকে বুঝতে আমি আবার ফিরে গিয়েছিলুম ওই কঠিন নাগরিক কবিতায়।

'রিকশার উপরে ক্লান্ত চীনে গনিকা যখন চোখ বোজে
সূর্য্যের অলস উত্তাপে,
তখন দিনরাত্রির নিঃশব্দতা
তোমার রক্তে আসে
নীল নদীর মতো'। এরপরে . . .
সকালে কলতলায়
ক্লান্ত গনিকারা কোলাহল করে,

খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি;
মাঝে মাঝে ক্লান্তভাবে কি যেন ভাবি –
হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি;
আর শহরের রাস্তায় কখনো প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।
আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি;
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো . . .

এই পর্যায়ের আর এক কবিতা –

'তোমার ক্লান্ত উরুতে একদিন এসেছিল
কামনার বিশাল ইশারা !
ট্যাঁকেতে টাকা নেই
রঙিন গনিকার দিন হল শেষ,
আজ জীবনের কুঁজ দেখি তোমার গর্ভে,
সেইদিন লুপ্ত হোক, যেদিন পুরুষ পৃথিবীতে আসে'। . . .

না। আবার বলছি। এ কবির কবিতা বাংলা ভাষা আগে দেখেনি। গনিকারা সব সময়েই ক্লান্ত এমনকি ইশারা করার সময়েও। তারা শরৎচন্দ্রীয় জগৎ থেকে অনেক দুরে। বিন্দুমাত্র 'যৌবন মদমত্তা' নয়। এই গণিকা তাহলে কে ? এত আমার দেশের মেয়ে। বেশ্যা নিয়ে অনেক সাহিত্য বাংলায় আছে। আছে অনেক কবিতা। কিন্তু এমন করুণাহীন জ্বালা ধরানো দুঃখ ? না আমি পাইনি।

কবিতা পড়ে যে মধ্যবিত্ত পাঠক শান্তি, আনন্দ অথবা নিবিড় দুঃখের অনুভূতি খোঁজেন, তাঁদের জন্যে এ কবি নন। বারবার মধ্যবিত্তকে আয়নার সামনে আনাই এই কবির লক্ষ্য। মধ্যবিত্তের স্বার্থপরতা, চতুরতা, সুবিধাবাদী মানসিকতা, প্রচ্ছন্ন নীতিহীনতা, ন্যাকামো, মেকি হতাশা, ফাঁপা প্রগতিশীল ভেক। কবিতায় বারবার ফিরে আসে। তার সঙ্গে মিলিয়ে ভাষা, ছন্দ।

'কত অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি,
কত দীর্ঘশ্বাস, কত সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো
আরো কত দিন'।

অথবা

'স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর শুভ্র বুক
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম, . . .

এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। যেখানে লাইনের পর লাইন বাক্য কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ক্রিয়াপদ নেই। এই ছিল তাঁর গদ্যছন্দের বিশেষত্ব। আমি তখন মনে করছি, সমর সেনের এই রিপিটেটিভ স্টাইলটা ধরতে পেরেছি। অগ্রজ জীবনান্দের কবিতার প্রভাব। তবে জীবনানন্দের ভাষার একদম অন্য প্রান্তের ধারে। ছন্দে এই যে অনেক

সময় ক্রিয়াপদ নেই, তার মধ্যে দিয়ে আধুনিক কবিতার বড় হাতিয়ার 'গুরুচণ্ডালী'কে সচেতন ভাবে এড়িয়ে যাওয়া ছিল তাঁর বৈশিষ্ট। এবং কোন বৃত্ত মেনে তাঁর ছন্দকে মাপা যাবেনা।

এই রকম যখন আমার ধারনা গড়ে উঠছে, তখন আমার এক বন্ধু পাতা উলটে পেছনে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল . . .

'মাস্তুলের দীর্ঘ রেখা দিগন্তে
জাহাজের অদ্ভুত শব্দ,
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে বিষণ্ন নাবিকের গান। . . .
কত দিন, কত মন্থর দীর্ঘ দিন,
কত গোধুলি-মদির অন্ধকার,
কত মধুরাতি রভসে গোঙায়নু,
আজ মৃত্যুলোকে দাও প্রাণ
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ন নাবিকের গান'।

আজ এতদিন পরেও স্বীকার করি, ওই মধ্যযুগের পদাবলীর ব্যবহার – 'মধুরাতি রভসে গোঙায়নু', আমাকে মাটিতে পেড়ে ফেলেছিল। তাঁর ছন্দ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। বিষ্ণু দে থেকে বুদ্ধদেব বসু সবাই তাঁকে অন্ত্যমিল ছেড়ে দিয়ে গদ্যছন্দে লিখতে পরামর্শ দিয়েছেন। এতদিন পর মনে হয় অক্ষরবৃত্তের চালটা তাঁর হাতে ছিল। কিন্তু ওই পুরনো অক্ষরবৃত্ত বা এমনকি মাত্রাবৃত্তের পয়ার দিয়ে আবেগের ট্যাপ খোলা উচ্ছ্বাসকে আটকান যাবে না, তিনি এটা বুঝেছিলেন।

আজ বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'প্রথমে আমার প্রনতি গ্রহন করো পৃথিবী' অথবা 'পশ্চিমের বাগান বন চষা – খেত / মিলে গেছে দূর বনান্তে বেগনি বাষ্পরেখায় . . .' এই গদ্য ছন্দ দিয়ে তিরিশের নাগরিক মধ্যবিত্তের ক্লীব জগৎকে কবিতার ভাষায় আনা যাবে না, এটা সমর সেনের আয়ত্ত ছিল। অথচ কিছুটা অস্বাভাবিকভাবে কবি জীবনের শেষের দিকে একদম পাক্কা অক্ষরবৃত্তে পয়ারে কবিতা লিখেছেন।

'সাপ যত বসে আছে শিকারের তালে।
রাত্রি এল, মৃত্যু লেখা ব্যাঙের কপালে।।
মহাজন গান গায়, নদারৎ ধান।
অন্ধকার প্রেতলোকে ভাবে ভগবান।।
অক্ষম এ রায়বার ঈশ্বরকথনে।
প্রভুর বন্দনা শুনি বেনের ভবনে'।।

মনে হবে ঈশ্বর গুপ্ত ঘরানায় কেউ কবিতা লিখতে চাইছে। তাঁর হাতে এরকম ছন্দ দেখে অনেকেই অনেকদিন ধরে অবাক হয়েছে। কেউ কেউ আশাভঙ্গে হতাশ হয়েছেন। যুবক সুনীল গাঙ্গুলী নাম করে নিজের রাগের কথা লিখেছিলেন ১৯৫৮ সালে। 'কৃত্তিবাসে' . . .

'যে সমস্ত সৈনিক পুরুষেরা পানিপথ, হলদিঘাট, ফতেপুর সিক্রির ধুলোয়
স্বেদ আর শোণিত ঝরিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাদের
হাতিয়ারের ধারে জ্বলত কলকাতার রোদ উনিশশো

চল্লিশে। পার্কের ঘাসে পিঠ দিয়ে শুয়ে থাকত সমর সেন . . .।
দেখা যায় সেই কিশোরপ্রতিম যুবাকে . . .।
একটি কবিতার লাইন যারা আর কখনো আসেনি
এই রাস্তায়, হাঁটেনি আমাদের অনুভূতির জগতে। ছন্দ
ছুঁড়ে দিয়েছিলে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্যদের দিকে। তখন ভাবিনি
তুমি নিজেই কোনদিন
সত্যেন দত্তের মতো নির্ভেজাল মাত্রাবৃত্ত কিংবা ত্রিপদী হোয়ে যাবে'।

(. . . সমর সেন/সুনীল গাঙ্গুলী)

কবি জীবন মাত্র বারো বছর। আঠারো থেকে শুরু করে হঠাৎ তিরিশ বছর বয়সে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন কিন্তু তিনি সবচেয়ে আলোচিত কবি। বিদগ্ধ মহলে জীবনানন্দ বা বিষ্ণু দের থেকেও বেশী তিনি চোখে পড়েছেন। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য ১৯৪৪ সালে অরণী পত্রিকায় লিখেছিলেন "গদ্য ছন্দে সমর সেনই দেখা যাচ্ছে আজ পর্যন্ত অদ্বিতীয়"। এই রকম একটা সময়ে কেন হঠাৎ ছেড়ে ছিলেন? কোথাও মুখ খোলেননি। একবার বন্ধু দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করে চিঠি লিখলে স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গে উত্তর দেন। "নাঃ। কবিতা আর আসে না। কোষ্ঠবদ্ধতা আমার সেরে গেছে"।

অনেকে মনে করেন বাইশ বছর বয়সে লেখা In defence of decadence নিয়ে তাঁর সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির শিল্প সমালোচক সরোজ দত্তের সঙ্গে যে তর্ক পালটা বিতর্ক হয়েছিল, তার ফলশ্রুতিতে নিজেকে শ্রমিক কৃষকের কাছাকাছি, বিপ্লবী আন্দোলনের কবি প্রমান করার এক অবচেতন ইচ্ছে থেকে সরল পয়ারে লিখতে শুরু করেছিলেন। ব্যঙ্গ, তির্যক চোখে মধ্যবিত্তের মুখোশ খোলাকে থামিয়ে দেন। কিন্তু হয়ত বুঝেছিলেন ঠিক হচ্ছে না, ওভাবে নিজেকে পাল্টানো সম্ভব হচ্ছে না। কবিতা লেখা বন্ধ হয়ে যায় কিছুদিন পরেই।অনেকপরে একটি ছোট লিটল ম্যাগাজিনে বলেছিলেন 'ছক মেলানো সম্ভব হচ্ছিল না'।

না মিথকে বোঝা যায় নি।

নিজে কোনদিন কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার হতে চাননি। পার্টি শৃঙ্খলার আঙুল হেলানোতে নাচার ইচ্ছে ছিল না বলে। থেমে যাবার আগে সেই অতি বিখ্যাত কবিতা, ১৯৪৬ সালে –

'শুনি না আর সমুদ্রের গান
থেমেছে রক্তে ট্রামবাসের বেতাল স্পন্দন।
ভুলে গেছি সাঁওতাল পরগনার লাল মাটি.....
ভুলে গেছি বাগবাজারী রকে আড্ডার মৌতাত,
বালিগঞ্জের লপেটা চাল, . . .
রোমান্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না কবিতায়।
যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে।
বছর দশেক পরে যাব কাশীধামে'।

নিজেকে নিয়ে শ্লেষ, ব্যঙ্গ দিয়ে হুইসল বাজিয়েছিলেন।

সমর সেন মারা যাবার বছর দুয়েক আগে ধর্মতলা স্ট্রিট (লেনিন সরণী) থেকে ভেতরে ঢুকে মট লেনে ফ্রন্টিয়ার

পত্রিকার অফিসে তাঁকে দ্বিতীয় ও শেষবার দেখতে পাই, এক বর্ষাধোয়া শেষ বিকেলে ।তখন তিনি বহু আলোচিত ইংরেজি সাপ্তাহিক ফ্রন্টিয়ারের কর্নধার এবং সব মধ্যবিত্ত ইংরেজি জানা বাঙ্গালির কাছে ফ্রন্টিয়ার, পান্ডিত্যপূর্ণ বামপন্থী, তুখোড় ইংরেজি সাপ্তাহিক হিসেবে মিথে পরিনত হয়ে গেছে। টানা পনেরো বছর ধরে।

সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠে পুরনো হল ঘরে এককোণে বসে পত্রিকার এডিটিং-এর কাজ করছেন। বেশ কিছু অতি বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীর নাম ভেসে আসছে কথাবার্তায়। লেখা এসেছে কিনা, কবে আসবে ইত্যাদি।

আমি দূর থেকে দেখছি মানুষটাকে। সেই শীর্ণকায়, সারা শরীর জীর্ণ, অসুস্থতার লক্ষণ। এই লোকটা কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছে আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে। অথচ গদ্য ছন্দ আর কোলকাত্তাইয়া মধ্যবিত্তর মুখোশ খোলার কবিতা নিয়ে কথা উঠলে এখনো তাঁর নাম ওঠে। মোমিনপুরে বন্ধুর বাড়ি থেকে আড্ডা দিয়ে মাঝরাতে বেহালায় হেঁটে ফেরার সময় নির্জন রাস্তায় ট্রামের আওয়াজে কবিতার ছন্দ খুঁজে পেতেন। কুড়ি বছর বয়সে London times literary supplement এ তাঁর কবিতা নিয়ে লেখা বেরিয়েছে। প্রয়াত সরোজ দত্ত যেমন বলেছিলেন সেরকম সত্যই কি এই ছোটখাটো মানুষটি। ইনি হতাশা আর ব্যর্থতার কথা খালি প্রচার করেছেন ? ভেঙ্গে পড়া 'পেটি বুর্জোয়া' সমাজের অবক্ষয়ের কবি ? উনি তো চেয়েছিলেন 'আকাশ গঙ্গা আসুক নেমে'। আর সেই একুশ বছর বয়সে লিখেছিলেন

'আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল
নামুক মহুয়ার গন্ধ'।

আমি নেমে আসছি। সাবেকি কোলকাতার সরু মট লেন। এই গলি যেখানে লেনিন সরণিতে মিশেছে তার দুদিকে ছোট ছোট বার। কলগার্ল, বৃদ্ধা বেশ্যারা সন্ধ্যের পর ওখানে ভিড় করে। বড় রাস্তায় বেরিয়ে বাঁদিকে এগুলে বারদুয়ারী, আরো উজীয়ে গেলে লেনিনের স্ট্যাচু। ডান দিকে এগুলে খালাসিটোলা। সেপ্টেম্বরের বর্ষায় হাওয়ায় স্যাঁতস্যাঁতে ভাব । গলির মুখে সাট্টার বুকির দোকান। উল্টোদিকে ফুলের দোকানে বর্ষার জলে ভেজা স্বর্ণচাঁপার তোড়া থেকে গন্ধ ভেসে আসছে। সামনে ঢং ঢং করে ট্রাম, আওয়াজ করে চলে গেল। আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল আমাদের হাওড়ার এঁদো সেকেন্ড বাই লেনের নির্জন দুপুরে, টেবিলের ওপর খোলা, হালকা হলুদ রঙের ওপর শুকনো রক্তের রঙে ডিজাইন করা বইটাকে।

'ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি।
বাতাসে ফুলের গন্ধ,
আর কিসের হাহাকার'।

---

*সত্যজিতের বনলতা সেনের কভার, রুপসী বাংলার কভার, নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আপাত অতি সাধারণ প্রায় রূপহীন এই কভারটি নিয়ে কোন উল্লেখ পাইনি। অথচ এই কভার আকর্ষণ প্রচেষ্টাহীন গভীর ভালোবাসার চিহ্ন হয়ে থাকবে।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সময়

পর্ব ১

কলকাতা শহর। সবেমাত্র সকাল হয়েছে। সূর্যদেব আড়মোড়া ভেঙে তোড়জোড় শুরু করেছেন দিনের কাজের। গত কয়েকদিন ধরে আকাশ খুব মেঘলা যাচ্ছিল। এই সময়টা উজ্জ্বল রোদের সময়, তবু মাঝে মাঝেই দু-এক পশলা বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিচ্ছিল শহরের পথ-ঘাট ও অসতর্ক নাগরিকদের। সকালবেলা মেঘের সঙ্গে ক্রমাগত লুকোচুরি খেলতে থাকা সূর্যকে দেখলে মনে হচ্ছিল যেন একটাই গোলাকার আলোক পিণ্ড খেলাচ্ছলে একবার চাঁদ একবার সূর্য হয়ে যাচ্ছে। আজ কিন্তু আবহাওয়ার মনোভাব অন্যরকম। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। ঝক্‌ঝকে পরিস্কার একটা প্রেক্ষাপট পেয়ে সূর্যও যেন আজ একটু আগেভাগেই মাঠে নেমে পড়েছে। এ শহরে এখন বহুতল বাড়ির সংখ্যা প্রচুর। কলকাতা শহরের যে পুরানো অংশ, সেখানে এখনও অনেক একতলা — দোতলা — তিনতলারা রয়ে গেলেও, শহরের পুবদিকে নবীনতর যে অংশটা পরিকল্পনামাফিক গড়ে উঠেছে, সেখানটায় বহুতলেরই জয়জয়কার। কাজেই সূর্যদেব ওই দিকটা দিয়ে শহরে ঢোকবার সময় বহুতলগুলোর উঁচু পাদানিতে থাকা ফ্ল্যাটগুলোয় যথেচ্ছ উঁকিঝুঁকি মারতে থাকেন।

ঠিক এই মুহূর্তেই যেমন একটুকরো রোদ্দুর পর্দা না টানা খোলা জানলা দিয়ে সোজা ধাক্কা মারল সাদা বিছানায় একটু আড় হয়ে শুয়ে থাকা মানুষটার মুখে। আলোর প্রথম ধাক্কায় মুখটা ঈষৎ কুঁচকে গেল মানুষটার। বোঝাই যাচ্ছে, ধীরে ধীরে ঘুমের প্রকোপটা কমে আসছে তার। ওই এক টুকরো আলোয় সচেতন হয়ে উঠতে চাইছে মস্তিকের কোষগুলি। ধীরে ধীরে চোখ খুলে চাইল মানুষটা আর সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র ব্যথায় আবার চোখ বুজে ফেলল। না:, মাথার ব্যথাটা যায়নি এখনও, গায়েও উত্তাপটা বেশ কিছুটা টের পাওয়া যাচ্ছে। আরও একটুখানি চোখ বুজে শুয়ে থেকে এবার যেন মনের জোরে এক ঝটকায় বিছানায় উঠে বসল মানুষটা। তারপর খাটের বাঁদিকে রাখা সাইড টেবিল থেকে একটা এ-ফোর সাইজের কাগজ তুলে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগল তাতে ছাপা থাকা ইমেল টায়।

''ডিয়ার মি সোমদত্ত সেন, ইটস্ আ প্লেজার টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন সিলেকটেড টু অ্যাটেন্ড দ্য 'ইউ অ্যান্ড ইওর পোয়েট মিট' হুইচ উইল বি হেল্ড অন ফিফথ্ ফেব্রুয়ারি অ্যাট হোটেল সিটি ইন অ্যাট ইলেভেন ইন দ্য মর্ণিং। প্লিজ মেক ইট সিয়োর টু ব্রিং আ কপি অব দিস মেল অ্যালং উইথ ইওর ফোটো আইডেনটিটি প্রুফ। হোপ, ইট উইল বি আ মেমোরেবেল এক্সপিরিয়েন্স ফর ইউ, রিগার্ডস'',.... ইমেলটায় এবার নিয়ে এই সতেরোবার চোখ বুলোতে-বুলোতে সোমদত্তর ঠোঁটের কোণে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। আহ আজ শেষ পর্যন্ত সেই দিন, শুধু এই দিনটার অপেক্ষাতেই সে কাটিয়ে দিয়েছে জীবনের প্রায় দুটো যুগ। তার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন যা সে পূরণ করে উঠতে পারেনি আজও। বহুজাতিক কোম্পানির চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার, প্রতিষ্ঠিত চাটার্ড অ্যাকাউনটেন্ট সোমদত্ত সেন জীবনে সব কিছু পাওয়ার ফাঁকে, সবার এমন কি নিজের অজান্তেই হয়তো খুঁজে রেখেছিল এই এক টুকরো স্বপ্ন, যে স্বপ্ন রোজকার দৌড়োদৌড়ির ভিড়ে প্রায় হারিয়েই যেতে বসেছিল। হঠাৎ খবরের কাগজের পাতায় একটা কোয়ার্টার পেজের বিজ্ঞাপন ঘুম থেকে ডেকে তুলেছে স্বপ্নটাকে। এই মুহূর্তে কলকাতা শহরে যে আন্তর্জাতিক কার্যসম্মেলন হচ্ছে, তারই অঙ্গ হিসাবে কিছু কবি, তাদের পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে কথা বলবেন একদম একান্তে। বিজ্ঞাপনটার সঙ্গে একটা ছোট্ট ফর্ম ছিল। তাতে লিখে দিতে হয়েছিল সোমদত্ত যাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়, কতটা জানে সে তার কবির সম্পর্কে। চোখ- কান বুজে ফর্মটা ভর্তি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল সোমদত্ত আর তারপরই গত পরশু এই ইমেল। ভেতরের ঘুষঘুষে জ্বর আর সদ্য ঘুম ভাঙার আলস্য — দুটোকেই সজোরে ফেলে এক ঝটকায় খাট ছাড়ল সোমদত্ত। একটা প্যারাসিটামল খেয়ে নিতে হবে চায়ের পরে আর তারপর দ্রুত তৈরী হয়ে নিতে হবে কবির কাছে যাওয়ার জন্য।

সাজানো-গোছানো লাউঞ্জটায় প্রায় ঘন্টাখানেক হল বসে আছে সোমদত্ত। বেশ কিছু মানুষজন এসেছে আজ এখানে তাদের প্রিয় কবিদের সঙ্গে কথা বলতে। অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়েদের সংখ্যা প্রচুর। ভালো লাগল ভেবে যে এখনকার ছেলে মেয়েরাও কবিতা পড়ে, তাদের ব্যস্ততম জীবনের ফাঁকে ফাঁকে। ওর হঠাৎ একটা কথা মনে হল বসে বসে, আচ্ছা, এই যে আজকের প্রজন্মের এতজন

এসে হাজির হয়েছে আজ এখানে, এদের মধ্যে ক'জন বাঙালি কবিদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, আর ক'জনই বা বিদেশী কবিদের সঙ্গে। এই প্রজন্মটা বড় হয়ে উঠেছে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে, বাংলা এদের কাছে প্রায় একটা ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজের মত। অধিকাংশই বাংলা ভাষাটাই ভালো করে বোঝেনা। না, এমন নয় যে সব্বাই একইরকম। একদল বাচ্ছা ছেলে-মেয়ে আছে যারা নিয়মিত বাংলা কবিতাপাঠের আসর বসায়। সোমদত্ত জানে, কিছুদিন আগেই তো একটা কমবয়সী মেয়ে এসেছিল বাড়িতে তাদের পত্রিকার জন্য একটা কবিতা চাইতে। তার মানে চর্চাটা তো হচ্ছে, কিন্তু সেটা কতটা? সন্দেহ আছে। আর সে সন্দেহ আরও গাঢ় হয় বইমেলায় গিয়ে দাঁড়ালে। বইমেলা সাধারণ বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের একটা খোলা প্ল্যাটফর্ম থেকে আজ মানুষের স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে উঠেছে। এখন অনেক মানুষ না গেলে খারাপ দেখায় তাই বইমেলায় যায়। আর বইমেলাতেও বইয়ের স্টলের সঙ্গে পাল্লা দিতে থাকে নানারকম খাবারের স্টল। সোমদত্ত দেখেছে অষ্টমী পূজোর রাতের মত দুড়দুড় করে মেলায় ঢোকে একগাদা মানুষ। ক'জন সত্যি সত্যিই বাংলা বই পড়ে তাদের মধ্যে? পড়লে কি বাংলা বইয়ের বাজারের এই দশা হয়? না:, অনেকক্ষণ বসে থাকতে হচ্ছে তো। একবার জিজ্ঞাসা করবে নাকি তার সুযোগ আসতে আর কতটা দেরী? রিসেপসনে একটি কমবয়সী সুন্দরী মেয়ে বসে আছে। হাসিমুখে এখানে আসা মানুষদের সামলাচ্ছে, ভিতরে পাঠাচ্ছে চূড়ান্ত ক্ষমতায়। এই মেয়েটিও কি পড়ে বাংলা সাহিত্য? এই দক্ষতা কি কেবল পেশাগত নাকি একটু ভালো লাগাও জড়িয়ে আছে ওর কাছে, ভাবতে - ভাবতে সোমদত্ত রিসেপসনের দিকে পা বাড়াল।

-'' আচ্ছা, আমার টার্গটা আসতে কত দেরী বলতে পারেন? '' পেশাদারী হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বিনীত চোখ তোলে মেয়েটি, '' একটু সময় লাগবে স্যার। আসলে বুঝতেইতো পারছেন এতজন এসেছেন এতজনের সঙ্গে দেখা করতে। প্লিজ বেয়ার উইথ আস। '' সোমদত্ত ঠোঁট উল্টোতেই বোধ হয় মেয়েটি কিছুটা সাহায্যের হাত বাড়াতে চায়, '' আপনার সিরিয়াল নম্বরটা কত যেন স্যার? এস. জিং থার্টি টু, তাই না? তার মানে ..... হ্যাঁ স্যার, মোটামুটি হয়ে এসেছে '' ডানদিকে চোখ চালিয়ে কি এক খোঁজবার চেষ্টা করে মেয়েটি আবার বলে ওঠে, '' ওই যে স্যার, ওই কোণের দিকে সোফায় যে ম্যাডাম বসে আছেন, উনি থার্টি ওয়ান, ওনার পরেই আপনার। ''

সোমদত্ত ডানদিকের কোণায় চোখ ফেরাতেই থমকে যায়। ওদিকটা রিসেপসন টেবিল থেকে দূরে বলেই বোধহয় ভীড় নেই তেমন। একটা সোফার এক কোণে বসে আছেন ভদ্রমহিলা। সোমদত্তেরই বয়সী হবেন। হালকা রঙের শাড়ি আর সীমিত অথচ পরিমিত সাজ ভদ্রমহিলার ব্যক্তিত্বটাকে আরও পরিস্কার করে জানান দিচ্ছে। সোমকে সবচেয়ে যেটা আকর্ষণ করল তা হল ভদ্রমহিলার চোখ দুটি। সামনের দিকে শরতের মেঘের মত উদ্বেগহীন, চাঞ্চল্যহীন একটা দৃষ্টি ভাসিয়ে রেখেছেন, কিন্তু সে ভাসতে থাকা দৃষ্টি পার করে চোখের দিকে তাকালে থমকে যেতে হয়। অদ্ভুত গভীর এক চোখ। যেন পৃথিবীর গহনতম হ্রদটি তুলে এনে বসানো হয়েছে ও চোখে। বেশীক্ষণ দেখলে সম্মোহিত হয়ে ডুবে যাওয়ার ভয় আছে। সোমদত্তর হঠাৎ মনে হল, ও চোখ সে চেনে। অনেক অনেকদিন থেকে চেনে। যেন ও চোখের সঙ্গে অনেকটা পথ হেঁটেছে ও, যেন ও চোখের ভাষা বড় পরিচিত তার। মনে পড়ছেনা, কিছুতেই মনে পড়ছেনা, অথচ .....। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। খুব কাছের কোনও কিছুকে চিহ্নিত না করতে পারবার অস্বস্তি। ওর ইচ্ছা করল ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ করতে।

''আপনিও কি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করবেন বলে অপেক্ষা করছেন?'' সোফার অন্য কোণটায় বসে সোমদত্ত আলাপ জমানোর চেষ্টা করল।

-'' হ্যাঁ '', ভদ্রমহিলা সোমদত্তর মুখের উপর দৃষ্টিটা একটু রেখেই সরিয়ে দিলেন। কেমন যেন মনে হল ভদ্রমহিলার দৃষ্টিতেও একটা খোঁজের হালকা আভাস আছে। ''আপনার পরেই আমি'', ও কথা এগোনোর চেষ্টা করল। ভদ্রমহিলা ততক্ষণে নিজেকে ডুবিয়ে নিয়েছেন সামনের টেবিলে পড়ে থাকা একটা ম্যাগাজিনে, সোমদত্তর কথা বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হলনা। ভদ্রমহিলা বোধহয় ডিস্টার্বড্ হতে চাইছেন না, এরপর আর আগ বাড়িয়ে কথা বলতে যাওয়াটা অভদ্রতা হয়ে যাবে, ভাবল সোমদত্ত। সত্যি বলতে কি, সেও দুম করে লোকের সঙ্গে ভাব জমাতে পারেনা খুব একটা। পেশা আর বয়স তাকে যতই চৌখশ করে তুলুক সমাজের চোখে, ভেতরে-ভেতরে আজও তার মধ্যে একটা গোবেচারা মুখচোর মানুষ রয়ে গেছে যাকে নিরাপত্তার কারণেই সে সবার সামনে বের করেনা। আসলে, আজ এত উত্তেজিত হয়ে আছে। পরিস্কারভাবে বলতে গেলে সোমদত্ত নয়, ওর ভেতরের সেই মুখচোরা মানুষটা আজ যেন বারবার ছটছফ করে উঠছে, বেরিয়ে আসতে চাইছে বুকভর্তি একগাদা প্রশ্ন নিয়ে। যেসব প্রশ্ন নিয়ে বোধের

উন্মেষ থেকে জীবনের পথে হেঁটেছে সোমদত্ত, যেসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া আজও বাকি রয়ে গেছে। সে'সব প্রশ্ন এক্সিকিউটিভ সোমদত্তর নয়, কবি সোমদত্তর, যে তার প্রাক যৌবন থেকে লিখে আর পড়ে চলেছে কবিতা। কবিতা তার কাছে মন্ত্রের মত। জীবন আর জীবনবোধ যদি উপাস্য হয়, তবে সোমদত্ত যেন তার কবিতা দিয়ে সে উপাস্যের আরাধনা করে চলেছে । তার কবিতা যে একদম ফেলে দেওয়ার নয় সে জানে, যারা তার কবিতা পড়েছে, তাদের মধ্যে অনেককেই মুগ্ধ হতে দেখেছে সোমদত্ত, আজ প্রায় গত পনেরো বছর ধরে বেশ কিছু লিটিল ম্যাগাজিন নিয়মিতভাবে তার কবিতা ছেপে চলছে, কখনও সখনো ঘরোয়া কিছু সাহিত্য সভাতেও ডাক পড়ে তার, তবু সোমদত্ত জানে কিচ্ছু হয়নি, এখনও অবধি কিছুই হয়নি। তার সাধনা আজও অসমাপ্ত , লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে। আজ এই বিয়াল্লিশে কবিতা সম্পর্কিত অনেক প্রশ্ন মাথায় ঘোরে তার। কবিতা কি? কবিতা কেন? কবিতার সৃষ্টি বলে কি কিছু হয় কিংবা বিনাশ বলে? তার কবিতারা কি সত্যি সতিই বোধের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে নাকি আজও তারা বসে আছে সিঁড়ির একদম নীচটাতে, একটা সিঁড়িও ছোঁওয়া হয়ে ওঠেনি তাদের? যবে থেকে সোমদত্ত কবিতা লেখা শুরু করেছে, পড়তে শুরু করেছে তারও আগে। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, শক্তি, শঙ্খ, সুভাষ, নীরেন - মণিমুক্তোখচিত কত ঘাটেই যে কাছি বেঁধেছে তার নৌকা, সমৃদ্ধ হয়েছে। তবু এনারা কেউ নন, অথবা বলা যেতে পারে এনাদের প্রতি মুগ্ধতা অতিক্রম করেও তার মুগ্ধতা, তার আবিলতা ছুঁয়েছে আরেকটি মানুষের কবিতাকে, সৃষ্টিকে। সে মানুষ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সুনীলের কবিতা তাকে ভীষণ টানে, টানে বললে কম বলা হয়, বলা উচিৎ, আবদ্ধ করে রাখে। সুনীলের কবিতার প্রায় প্রতিটি লাইন পড়তে পড়তে সোমদত্তর লাইন হয়ে যায়, সোমদত্ত নিজেকে দেখতে পায় সে'সব কবিতায়, একটা ইনট্রোস্পেকশন যেন। আজ সেই মানুষের সঙ্গে দেখা হবে তার, অবশেষে সে আর সুনীল গাঙ্গুলি মুখোমুখি। সারাজীবন সোমদত্ত ভেবে গেছে, কোনও একদিন ..... কোনও একদিন ..... আজ সেই দিন। আজ সুনীলের কাছে উজাড় করে দেবে সোমদত্ত নিজেকে। বলবে সুনীল দ্রোণচার্য হলে সে একলব্য, জানতে চাইবে তার সব প্রশ্নের উত্তর। কিভাবে কেউ লিখতে পারে 'ভালোবাসা এক তীব্র অঙ্গীকার?' কিভাবে কেউ ভাবতে পারে ভালোবাসা একটা হীরের গয়না? কিভাবে হেঁটে যায় নীললোহিত দিক শূণ্যপুরের পথে? কিভাবে সৃষ্ট ও লালিত হয় নীরা। নীরা। হয়তো কাল্পনিক, তবু সোমদত্তর জীবনের আলটিমেট আলটিমেট অ্যাণ্ড ইনডিফিনাইট। আর কল্পনাই বা কেন? সোমদত্ত কি তার জীবনে

কখনও দেখেনি কোনও নীরাকে? দেখেছিল, সেও সুনীলের মতই দেখেছিল, ধরে রাখতে পারেনি। নীরাদের বোধহয় ধরে রাখাও যায়না বাস্তবে, শুধু কবিতায় আবদ্ধ করা যায় তাদের। সোমদত্তও তাই করেছে। বছরের পর বছর সে তার এই দ্বিতীয় নীরা কে নিজের সৃষ্টিতে..... দ্বিতীয় নীরা। শব্দ দুটো মাথায় আসতেই সচকিত হয়ে উঠল সোমদত্ত। দ্বিতীয় নীরা, দ্বিতীয় নীরা, তার পাশে বসে থাকা এই ভদ্রমহিলাই দ্বিতীয় নীরা। চিনতে পেরেছে, এরই খোঁজে সে এতবছর .....। সোমদত্ত দ্রুত ঘাড় ঘোরালো, সোফার অন্য প্রান্তটা খালি। এ কি? কোথায় গেলেন ভদ্রমহিলা এর মধ্যে? ঝড়ের বেগে হলঘরের চারপাশে চোখ বোলাতে গিয়েই সোমদত্ত আবিস্কার করে স্যুইং ডোরটা ঠেলে হোটেলের বাইরে চলে যাচ্ছে তার দ্বিতীয় নীরা।

সোমদত্ত উঠে পড়ে। দ্রুতগতিতে লাউঞ্জের ভীড়টা ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়াতে চায় সে। তার দ্বিতীয় নীরার সঙ্গে দেখা করতে চায়, জানতে চায় এতদিন কোথায় ছিলে? বলতে চায়, আজীবন কিভাবে সোমদত্ত খুঁজে গেছে তাকে।

না। কোথাও নেই। অস্বাভাবিক দ্রুততায় রাস্তায় এসে দাঁড়ানোর হাঁফানিটা সামলাতে সামলাতে সোমদত্ত রাস্তার কোনও দিকেই খুঁজে পায়না আর সেই চেহারাটিকে। সোমদত্তর মন হঠাৎ ধূ ধূ শূণ্যতায় ভরে যায়। আবারও .... আবার এক ঘটনা ঘটল। চিনতে পেরেও ঠিক সময়ে চিনে উঠতে পারলনা সে তার নিজস্ব নীরাকে। নীরা আরও একবার তার কাছে এসে দূরে চলে গেল। দুপুরের তীব্র হলুদ রোদ্দুরে ভীড় আর ধূলোর কলকাতা শহরে আনমনে হাঁটতে থাকে সোমদত্ত। নিজের অজান্তেই পকেট থেকে ইমেলটা বের করে, সেটার দিকে তাকিয়ে এক চিলতে বিষণ্ন হাসি ফুটে ওঠে সোমদত্তের ঠোঁটে। না:, সুনীলের সঙ্গে আর দেখা করবেনা সে আজ। কি বলবে গিয়ে? তার নিজস্ব নীরা, দ্বিতীয় নীরা আবার হারিয়ে গেছে? মিশে গেছে জনারণ্যে তাকে একলা ফেলে রেখে? বলবে যে সে আজও নীরাহীন? ইমেলটা কুচিকুচি করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে নিজের কাছে নিজেকে লুকোতে লুকোতে ভীড়ে মিশে গেল সোমদত্ত।

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে। এবারেই প্রথম কলম ধরেছেন বাতায়নের পাঠকদের জন্য।

রমা জোয়ারদার

চা-ঘর

পর্ব ২

[পূর্ব কথা : রঘুর কোনো বাপ ছিল না। কিন্তু খুউব ভালো একটা মা ছিল। লোকের বাড়ি কাজ করে সে দু-বেলা রঘুকে পেট পুরে খাওয়াত। একটা ইস্কুলেও ভর্তি করে দিয়েছিল। কিন্তু রঘু যখন ক্লাস থ্রীতে পড়ে, তখন হঠাৎ করে ওর মা মারা গেল। মায়ের বন্ধু যশোদা মাসী রঘুর হাত ধরে চা-ঘরের মালিক জিতেন দাসের কাছে নিয়ে গেল। রঘুর বয়স খুব কম বলে জিতেন দাস প্রথমে তাকে দোকানে রাখতে চায়নি। কিন্তু যশোদার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত রঘুকে সে আশ্রয় দিল। রঘু ওখানেই বড় হতে লাগল। দোকানের কাজ কর্মও করতে লাগল। কিন্তু তার মন চায় স্কুলে যেতে, পড়াশোনা করতে। স্থানীয় স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বীরেশ্বর মল্লিক রঘুর পড়াশোনায় আগ্রহ দেখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন!]

বেলা এগারোটা বাজে, কিন্তু চা-ঘরে এখন একজনও খরিদ্দার নেই। অন্য দিন এইসময় দোকানে মোটামুটি ভালোই লোকজন থাকে । আসলে আজ ট্যাক্সি এবং অটো চালকরা তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বন্ধ ডেকেছে । রাস্তায় গাড়ি প্রায় চলছেই না। তাই পথের মধ্যে গাড়ি থামিয়ে কেউ আর আজ চা-টা খেতেও আসছে না ।

গত চার বছরে রাজারহাটের বাড়বাড়ন্তর কল্যাণে কালীচকের এই চা-ঘরের সামনের রাস্তাটারও অনেক উন্নতি হয়েছে। চওড়া, মসৃণ এই রাস্তাটা দিয়ে এখন অনেক গাড়ি যাওয়া আসা করে। তার মধ্যে অনেকগুলো দূরপাল্লার গাড়িও থাকে ।

রাস্তার উন্নতির সাথে সাথে চা-ঘরেরও এখন ভোল পাল্টে গেছে। আজকাল এখানে সকাল বিকেল গরম গরম পকোড়াও পাওয়া যায় ! সাদামাটা ইঁট বারকরা সেই দোকানটা এখন রঙ করে, টাইল লাগিয়ে, নতুন চেয়ার টেবিল সাজিয়ে একেবারে ঝকঝকে হয়ে গেছে। দোকানের সামনের খালি জায়গাটা আজকাল রোজ ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। সেখানেও গোটা কয়েক লাল প্লাস্টিকের টেবিল আর আর সাদা চেয়ার রাখা আছে। দোকানের সামনে দুদিকে দুটো ফুলের কেয়ারীতে নানারঙের মরসুমী ফুল ফুটে আছে ! পুরো জায়গাটায় একটা খুশি-খুশি ভাব ছড়িয়ে রয়েছে !

ফাল্গুনের শুরুতে আবহাওয়া এখন ভারি মনোরম । সকালের দিকে এখানে স্থানীয় কিছু লোক প্রায় রোজই আসে। তারা এসে চা-টা খেয়ে, খবরের কাগজের পাতা উলটে গল্প গুজব করে যে যার বাড়ি চলে গেছে ! দোকান ফাঁকা, কাজ তেমন নেই, তাই দোকানের বাইরে একটা জল-চৌকিতে বসে রঘু ওর বই-পত্র নিয়ে পড়াশোনা করছিল । আজকাল সময় পেলেই রঘু মন দিয়ে পড়াশোনা করে। বীরেশ্বর মল্লিক বলেছেন, স্কুলে না যেতে পারলেও, রঘু নিজে পড়াশোনা করে, প্রাইভেটে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক – সব পরীক্ষা দিতে পারবে ! তার জন্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সময়মত ফর্ম জমা দিতে হবে। বীরেশ্বর মাস্টারমশাই বলেছেন সে সব ব্যবস্থাও করে দেবেন ! রঘু কে বলেছেন – তুই শুধু মন দিয়ে লেখা পড়া কর। তোর দিক থেকে যেন চেষ্টার ত্রুটি না থাকে। আমার মনে হয়, সামনের বছরই তুই মাধ্যমিক দিতে পারবি ।

এই কথা শোনার পর থেকে রঘুর পেটের মধ্যে ভয় আর উত্তেজনা গুড়গুড় করছে ! সেই সঙ্গে মনে উৎসাহ টগবগ করছে।

বীরেশ্বর মাস্টারের প্রতি ওর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ওর পড়াশোনার বই জোগাড় করে দেওয়া, পড়া বুঝিয়ে দেওয়া – সব কিছুর দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন ! সমস্যা হচ্ছিল অঙ্ক আর বিজ্ঞানের বিষয়গুলো নিয়ে।

কিছুদিন আগে বকুল সে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। বকুল গত বছর মাধ্যমিক পাশ করেছে। এখন এগারো ক্লাসে পড়ছে। রঘু ভাবে, ওর মা বেঁচে থাকলে ও নিজেও গতবছরে মাধ্যমিক পাশ করে আজ বকুলের সাথেই এসারো ক্লাসে পড়ত ! কিন্তু সেসব ভেবে আর লাভ কি ? তবু তো রঘুর কপাল ভালো যে মাস্টার মশাইয়ের মত মানুষের সাথে ওর যোগাযোগ হয়েছে । আর বকুল ওকে আলোদিদির কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আলোদিদি বকুলদের স্কুলের অঙ্কের দিদিমণি । আলোদিদি বিয়ে-থা করেননি। চিরকাল মায়ের সঙ্গে, তাঁর দেখাশোনা করে আর স্কুলের শিক্ষকতা করে কাটিয়েছেন। দুবছর আগে ওনার মা মারা গেছেন। যদিও কোনদিনই তিনি প্রাইভেট টিউশনি করেন না, তবে কেউ কিছু বুঝতে না পারলে অনেক সময় তাকে বাড়িতে ডেকে পড়া বুঝিয়ে দেন ! রঘুকে পড়ানোর কথা বকুলই বলেছিল। কিন্তু, বকুলের একান্ত অনুরোধ সত্বেও প্রথমে উনি রঘুকে পড়াতে চাননি । তবে পরে রঘুর সম্পর্কে সব কথা শুনে ওর সাথে দেখা করতে রাজি হলেন। রঘু প্রথম দিন খুব ভয়ে ভয়ে ওনার কাছে গিয়েছিল। তারপর, সামনা সামনি কথা বলে আর রঘুর পড়াশোনার আগ্রহ দেখে একেবারে বিনা পয়সাতেই পড়াতে রাজি হয়ে গেলেন । সেই থেকে অঙ্ক আর বিজ্ঞান উনি পড়াচ্ছেন তো বটেই, সেইসাথে মাঝে সাঝে বই-খাতা দিচ্ছেন এবং এটা ওটা খেতেও দিচ্ছেন।

* * *

একটা মোটরবাইক এসে থামল চা-ঘরের সামনে। বই নামিয়ে উঠে দাঁড়ালো রঘু। বাইকে দুজন – একটি ছেলে, একটি মেয়ে । বাইক থামিয়ে হেলমেট খুলে দুজনে এগিয়ে এল টেবিলের দিকে । ছেলেটা বসেই বলল – 'দুটো চা, টোস্ট আর – আর কি পাওয়া যাবে তাড়াতাড়ি ?' রঘু অভ্যাসমত গড়গড়িয়ে বলছিল – 'ডিমের ওমলেট, ডিমসেদ্ধ, ডিমের . . .' ছেলেটা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল – 'দুটো ওমলেট! টোস্ট আর ওমলেট – দু প্লেট ! তাড়াতাড়ি !'

মেয়েটা তখনও বসেনি । এদিক ওদিক দেখতে দেখতে বলল – 'আপনাদের এখানে টয়লেট আছে ?'

বছর দুই তিন আগে পর্যন্ত চা-ঘরে টয়লেট বলে তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু এখন স্বচ্ছ ভারতের ধাক্কায় চা-ঘরেও একটা ভদ্র দুরস্ত টয়লেট আছে । রঘু মেয়েটিকে দোকানের ভিতরে নিয়ে গেল। খাবার জায়গার পরে একটা সরু প্যাসেজ । প্যাসেজে ঢুকে প্রথমে বাঁদিকে রান্নাঘর। তারপর কয়েক পা এগোলে টয়লেট ! বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে রঘু রান্না ঘরে ঢুকে গেল । মুরারীকে খাবার অর্ডারটা দিয়ে নিজেও কাজে হাত লাগাল ।

ছেলে মেয়ে দুটোকে কেমন যেন সন্ত্রস্ত মনে হচ্ছিল ! ছেলেটা ঘুরে ঘুরে বারবার রাস্তা দেখছে । দুজনকেই বেশ অস্থির মনে হচ্ছিল । সবে চার-পাঁচ মিনিট হয়েছে, মেয়েটা বাথরুম থেকে বেরোচ্ছিল, এমন সময় তীব্র গতিতে একটা জীপ এসে সশব্দে ব্রেক কষে চা-ঘরের সামনে দাঁড়ালো ! সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম চিৎকার, চেঁচামেচি এবং হুংকার শোনা গেল । হুড়মুড় করে ছ'জন লোক লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে 'ওই তো, ওই তো', 'মার শালাকে', 'ধর বেটাকে' – ইত্যাদি গালাগাল দিতে

দিতে ছেলেটার দিকে তেড়ে এল ! ছেলেটাও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে কাঠ, তবু তেজ বজায় রাখার চেষ্টা করছে – ভঙ্গিটা সতর্ক !

এদিকে চেঁচামেচি শুনেই রঘু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দোকানের ভিতর থেকেই কাঁচের জানালা দিয়ে সব দেখছিল। মেয়েটা বাথরুম থেকে বার হয়ে সোজা সাঁত করে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। মুরারী ঘাবড়ে গিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল – 'কি ব্যাপার ? আপনি রান্নাঘরে ঢুকছেন কেন ?' মেয়েটা কোন উত্তর না দিয়ে রান্না ঘরের এক কোনায় গিয়ে কোনঠাসা ইঁদুরের মত ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল ! মুরারীর চিৎকার শুনেই রঘু রান্না ঘরে ফিরে এসেছিল ! মেয়েটাকে দেখে বিপদটা আন্দাজ করল । তবু আস্তে করে বলল – 'আপনি বাইরে গিয়ে বসুন ।'

ভয়ে মেয়েটা ঠিক করে কথাও বলতে পারছিল না । কোনক্রমে বোঝাল, ওই লোকগুলো ওকে দেখতে পেলে ওকে ধরে নিয়ে যাবে আর ছেলেটাকে হয়তো মেরেই ফেলবে !

মুরারী আপনমনে গজগজ করতে লাগল – 'যত্ত ফালতু লফ্‌রা!'

রঘু দুই-এক মূহুর্ত কিছু একটা ভেবে নিল। তারপরেই ঝট করে প্যাসেজের দড়িতে টাঙানো বিল্টুর লুঙ্গি, টি-শার্ট আর গামছাটা টেনে নিল। বিল্টু আজ দু'টোর পরে আসবে ! মেয়েটার দিকে সেগুলো এগিয়ে ধরে বলল – ভাববার সময় নেই। আপনার জামাকাপড়ের উপরেই এই লুঙ্গি আর টি শার্টটা পরে নিন।' মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গেই লুঙ্গিটা কোনো রকমে জড়িয়ে নিল। রঘু বলল – 'এবার জ্যাকেটটা খুলে ফেলুল। কামিজের উপর টি-শার্ট টা পরে নিন। আর গামছা দিয়ে নিজেকে একটু ঢেকে ফেলুন!' মেয়েটা পুতুলের মত রঘুর কথা অনুসরণ করছিল । 'ব্যাস, এবার পিছন ঘুরে আটা মাখুন। একটু আটা মুখে লাগিয়ে দিন'।

মুরারী হাঁ করে রঘুর কাণ্ড কারখানা দেখছিল ! ওদিকে বাইরে তখন তুমুল গন্ডগোল চলছে।

গুন্ডামত লোকগুলো ছেলেটার কলার চেপে ধরে ধমকাচ্ছে, দু চারটে চড় চাপড়ও লাগচ্ছিল। জিতেন দাস রোজকার মতো দোকানের এক কোনায় বসে ক্যাশ বাক্স সামলাচ্ছিল। পারতপক্ষে সে ওই জায়গা ছেড়ে ওঠে না। কিন্তু আজ বড়সড় একটা গণ্ডগোলের ভয়ে সীট ছেড়ে উঠে দোকানের দরজায় এসে দাঁড়ালো। বেশ বাজখাঁই গলায় বলল – 'আমার দোকানে এসে তোমরা হুজ্জোত করছ কেন ? এতগুলো লোক মিলে একটা ছেলেকে মারধোর করছ, তোমাদের লজ্জা করেনা ?' লোকগুলো রুক্ষ স্বরে তেড়িয়া ভঙ্গিতে জবাব দিল – 'কি করব বলুন তো দাদু ? পূজো করব শয়তানটাকে? এই শ্লা আমাদের ঘরের মেয়েকে ফুসলিয়ে বার করে এনেছে। আমরা জানি ও এখানেই কোথাও আছে!' জিতেন দাস বলল – 'কিন্তু দেখতে তো পাচ্ছ এখানে কোনো মেয়ে নেই!'

ওরা মানল না, বলল – 'আলবাত আছে। ভিতরে আছে !' জিতেন দাসের বুকের মধ্যে তখন ভয়ে ধড়াস ধড়াস করছে। ভাবছে, না জানি কি খুনোখুনি কাণ্ড হয় এই চা-ঘরে! কিন্তু সে লোকগুলোকে সেটা বুঝতে দিল না। যথাসম্ভব নির্বিকার ভাবে বলল, বেশ তো তোমরা ভেতরে এসে দ্যাখ। এইটুকু তো দোকান ! আসলে বাইরে থেকে যা দেখতে পাচ্ছ ভিতরে এসেও তার থেকে বেশি কিছু দেখতে পাবে না। তবু চাইছ যখন ভেতরে এসে দেখে যাও।

– 'দেখব তো বটেই। সেই তীরপূর্ণি থেকে ফলো করছি। স্পষ্ট দেখেছি, বাইকে দু জন ছিল। যাবে কোথায়?' বলতে বলতেই ওরা দোকানের ভিতরে ঢুকে গেল। খাবার জায়গায় টেবিল চেয়ার খালি পড়ে আছে। ঘর খালি, দেখার বিশেষ কিছু ছিল না । তবুও ওরা ওদের মত দেখে নিয়ে বলল – 'টয়লেট কোথায় ?'

জিতেন দাস হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল। দুটো লোক বাথরুমে ঢুকে খুঁজে এল। সেখানেও নেই। রান্নাঘরে উঁকি দিল। সবার বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে গেল। জিতেন দাস নিজের সীটে বসেই বলল, জুতো পায়ে আমরা রান্নাঘরে যাইনা। ওখানে

মুরারী আর বিল্টু কাজ করছে। বাইরে থেকেই পুরো ঘরটা দেখতে পারেন। ওখানে কেউ লুকিয়ে থাকার কোনও জায়গা নেই।

বিল্টুবেশী মেয়েটা তখন রান্নাঘরের দরজার দিকে পিছন করে আটা মাখছে আর কুলকুল করে ঘামছে। গামছাটা ঘাড়ের উপর দিয়ে চুল ঢেকে গলায় ঝুলিয়েছে। সেই গামছাতেই একবার মুখ মুছে নিল। মুরারী মাথা নীচু করে একমনে পেঁয়াজ কেটে যাচ্ছে। রঘু মেয়েটাকে একটু আড়াল করে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

লোকগুলো মেয়েটাকে খুঁজে না পেয়ে মনঃক্ষুন্ন হয়ে দোকান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু চলে গেল না। যে দুটো লোক ছেলেটার দুপাশে দাঁড়িয়ে ছিল তারা বলে উঠল – 'কি হল? নেই?'

অন্য লোকগুলো এ ওর মুখের দিকে তাকাল। একজন ঘাড় নেড়ে জানাল – 'না, নেই!' বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দুটোর মধ্যে একজন প্রতিবাদের ভঙ্গিতে জোর দিয়ে বলল – 'হতেই পারে না। তীরপূর্ণি থেকে ফলো করছি। সবাই দেখেছি, নীল জ্যাকেট পরা একটা মেয়ে বসেছিল পিছনে। সে তো আর উবে যেতে পারে না!'

এবার রঘু একটা দুঃসাহসের কাজ করে বসল। সোজা দোকানের বাইরে এসে বলল, তখন থেকে আপনারা মেয়ে মেয়ে করছেন কেন ? বাইকের পিছনে তো আমি ছিলাম।

লোকগুলো অবজ্ঞার হাসি হেসে রঘুকে নস্যাৎ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই রঘু বলে উঠল, আর শুনুন, তীরপূর্ণি নয়, ফুলবাড়ি থেকেই আমি ওনার বাইকের পিছনে ছিলাম।

ওরা রঘুর কথা মোটেই বিশ্বাস করছিল না! বলল –

– ঢপ দিচ্ছ?

– পুঁচকে ছোঁড়া! বেশি কথা বোলনা !

– গল্প বানাতে জায়গা পেলে না ?

রঘুও সমান তেজে উত্তর দিল – 'গল্প বানাব কেন? সত্যি কথাই বলছি। বিশ্বাস না হয়, যান গিয়ে খোঁজ নিন। কাল ফুলবাড়ীতে পিসীর বাড়ি গিয়েছিলাম। জোড়া মন্দির তলায় নেমে, ডানদিকের রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে বাঁ দিকের গলিতে গিয়ে দ্বিতীয় বাড়িটার পাশ দিয়ে একটা সরু রাস্তা আছে। সেই রাস্তার ছ'নম্বর বাড়িটাই আমার পিসির বাড়ি। কাল রাতে ওখানে ছিলাম। আজ সকালে ফিরব, দাদুকে কথা দিয়ে গেছি। অথচ এদিকের বাস, শেয়ারের অটো কিছু পাচ্ছিলাম না। না এলে দাদু দারুণ ঝাড় দেবে , মাইনেও কেটে নেবে। কি করব? এর তার কাছে লিফট চাইছিলাম তখন। কেউ থামছিল না। এই দাদাটা আমাকে লিফট দিল। আমিই ওনাকে বললাম, দাদা আমার এত উপকার করলেন আজ। আমাদের দোকানে এক কাপ চা খেয়ে যান। তাইতেই উনি এখানে এলেন!'

রঘুর গল্পটা এতটাই বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিল যে লোকগুলো প্রায় মেনে যাচ্ছিল। কিন্তু একটা লোক বলে উঠল – 'কিন্তু তার গায়ে এই পোশাক তো ছিল না ! একটা নীল জ্যাকেট পরা ছিল!' রঘু আঙুল তুলে বলল – 'এক মিনিট।' বলেই সে আবার রান্না ঘরে চলে গেল। মেয়েটা ফ্যাকাশে মুখে, ভীত চোখ তুলে রঘুর দিকে তাকাল। রঘু মেয়েটার ছেড়ে রাখা জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে বলল – 'কিছু মনে করবেন না দিদি, আপনার জ্যাকেটটা একবার পরতে হচ্ছে ।'

কথাটা বলতে বলতেই জ্যাকেট পরা হয়ে গেল। রঘুর গায়ে একটু টাইট হলেও খুব একটা বেমানান হল না। বাইরে গিয়ে রঘু বলল – 'এই জ্যাকেটটার কথা বলছেন ? এটা অবশ্য ঠিক নীল নয়। স্লেট রঙ বলা যায়। আমার এই একটাই জ্যাকেট। গত শীতে দাদু কিনে দিয়েছিল!'

লোকগুলো কথা বন্ধ করে রঘুকে দেখছিল। রঘু আবার জিজ্ঞাসা করল – 'কি, এটার কথাই বলছিলেন তো?' একজন যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে উত্তর দিল – 'হ্যাঁ এটাই!' অন্য সবাই কে হাত দিয়ে ইশারা করে বলল – 'চল!'

পাশে দাঁড়ানো লোকদুটো ছেলেটাকে জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে চলে গেল! সে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে দোকানের দেওয়ালটা ধরে সামলে নিল !

এবার জীপটা ছেলেগুলোকে নিয়ে বিদায় হল! সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। জিতেন দাস নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। মুরারী এতক্ষণ দোকানের জানলায় আটকে ছিল। এবার রান্নাঘরে ফিরে গেল। রঘুও রান্না ঘরে ফিরে মেয়েটাকে বলল – 'এই নিন দিদি, আপনার জ্যাকেট। লোকগুলো চলে গেছে!'

মেয়েটা রঘুর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল – 'গতজন্মে তুমি নিশ্চয় আমার ভাই ছিলে। তোমাদের জন্যই আজ আমরা বেঁচে গেলাম!' মেয়েটার দুচোখ বেয়ে জল পড়ছিল। জিতেন দাস তার নিজের জায়গা থেকেই বলল – 'ওকে বেরোতে বারণ কর, রঘু! লোকগুলো ফিরে আসতে পারে। মুরারী, ওদের অর্ডার দেওয়া খাবার গুলো দে!'

মুরারী চা, টোস্ট, ওমলেট একটা ট্রেতে সাজিয়ে দিল। রঘু খাবারটা মেয়েটাকে দিয়ে বলল – 'দিদি আপনি ওই টুলে বসে খাবারটা খেয়ে নিন। আমি বাইরে দাদাকে চা-টা সব দিয়ে আসছি।' মেয়েটা বলল – 'কিন্তু এখন আমি কিছুই খেতে পারব না!'

মুরারী বলল – 'না খেলেও, যা অর্ডার করেছেন তার দাম কিন্তু আপনাকে দিতেই হবে!'

মেয়েটার কান্না ভেজা মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। চায়ের কাপ তুলে নিয়ে সে বলল – 'আপনারা যা করেছেন, তার জন্য লাখ টাকা দিলেও আমাদের ঋণ শোধ হবে না।'

ওদিকে বাইরে ছেলেটা কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হয়ে আবার তার চেয়ারে গিয়ে বসল। রঘুকে চা আনতে দেখে জিজ্ঞাসা করল – 'ও আসবে না ?'

রঘু টোস্ট ওমলেট এগিয়ে দিয়ে উত্তর দিল – দিদিকে রান্নাঘরে খাবার দিয়েছি। দাদু এখন ওখান থেকে বেরোতে মানা করলেন!'

কৃতজ্ঞতায় ছেলেটার চোখে জল এসে গিয়েছিল। 'আপনারা আমাদের জন্য যা করলেন . . .' কথাটা সে শেষ করতে পারল না। গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে বলল – 'আমি তো প্রাণের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম!'

রঘু কৌতুহল চেপে রাখতে পারে না, বলে ওঠে – 'কিন্তু ওরা কারা ? আপনারা কি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন ?'

ছেলেটা এবার চোখ মুখ মুছে সোজা হয়ে বসল – 'আমরা আসলে দুজনে দুজনকে খুব ভালোবাসি। কিন্তু জানেন তো আমাদের সমাজ ব্যাবস্থা ! আমাদেরকে কিছুতেই মিলতে দেবে না। তাই আমরা এখান থেকে পালাচ্ছি।'

রঘু কিছু বলবার আগেই জিতেন দাস ডাক দিল – 'রঘু এখন গল্প করার সময় নয়। ওকে খেতে দাও!' জিতেনের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে রঘু ব্যস্তভাবে খালি ট্রে-টা উঠিয়ে নিয়ে বলল – 'আপনার খাওয়া হয়ে গেলে, দাদু, মানে ওই যে মালিক বসে আছেন, ওনার কাছে যাবেন!'

এদিকে রান্নাঘরে মেয়েটা শুধু চা-টুকুই খেল ! সে লুঙ্গি আর টি-শার্ট খুলে রেখে জ্যাকেটটা পরে নিয়ে বেরোতে যাচ্ছিল। রঘু আটকে দিল – 'আপনি এখানেই বসুন। দাদু ওনার সাথে কথা বলছেন !'

ছেলেটা জিতেন দাসের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে জিতেন তার দিকে খাবারের বিলটা এগিয়ে দিল। দাম দেখে নিয়ে ছেলেটা মনি ব্যাগ বার করতে করতে বলল – 'আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাব, জানিনা ! আজ . . .'

হাত তুলে ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিল জিতেন – 'কোনো দরকার নেই!'

ছেলেটা থমকে গিয়ে প্রশ্ন সূচক 'অ্যাঁ?' করে উঠল।

জিতেন মাথা নাড়ল – 'মানে, ধন্যবাদের দরকার নেই। এখন সময় কম, কয়েকটা কথা আমার জানা প্রয়োজন। লোকগুলো এসেছিল কেন ? প্রেমঘটিত ব্যাপার ?'

ছেলেটা দু'চার সেকেন্ড চুপ থেকে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল – 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমরা দুজনে দুজনকে খুব ভালোবাসি। কিন্তু . . .'

জিতেন আবার হাত তুলে ছেলেটাকে থামিয়ে দিল – 'বেশি বলবার দরকার নেই। আরেকটা কথা বল। তোমরা এখন এখান থেকে কোথায় যাচ্ছ ?'

ছেলেটাও এবার 'টু দি পয়েন্ট' উত্তর দিল – 'হাওড়া স্টেশন'।

জিতেন দাস কি যেন একটা ভাবছিল। ছেলেটা ওনাকে চুপ দেখে আবার যোগ করল – 'খুলে বলব কি?'

জিতেন ছেলেটার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল – 'না, তার দরকার নেই। এবার আমি যা বলছি সেটা একটু মন দিয়ে শোনো। শোনার পর তোমার যা বিবেচনা তাই করবে !'

ছেলেটার ভঙ্গিটা সঙ্গে সঙ্গে একটু পাল্টে গেল। সেটা লক্ষ্য করে জিতেন আবার একটু হাসল – 'ভয় নেই। আমি তোমাকে জ্ঞান দেবো না বা ধরিয়েও দেবো না। আমি তোমাদের নিরাপত্তার কথা ভাবছি। লোকগুলো এখান থেকে চলে গেছে ঠিকই, কিন্তু মোটেও খুশি মনে যায়নি। হতে পারে ওরা আশেপাশে কোথাও তোমাদের দুজনকে হাতেনাতে একসাথে ধরবার জন্য ঘাপটি মেরে বসে আছে।

ছেলেটার মুখটা শুকিয়ে গেল। কোনোক্রমে বলল – 'তাহলে? কি করব ?'

জিতেন ওকে আশ্বস্ত করে বলল – 'আমি বলি কি, তোমরা দুজন একসাথে যেওনা। তুমি বাইক নিয়ে যেমন এসেছ চলে যাও। আমি মেয়েটিকে কিছু একটা ব্যাবস্থা করে হাওড়া স্টেশন পাঠিয়ে দেব। ট্রেন ক'টায়?'

ছেলেটা কিছু ভাবছিল। ভাবনা থেকে ফিরে উত্তর দিতে একটু সময় লাগল – 'দুটো দশ !'

– 'ঠিক আছে। তার আগেই পৌঁছে যাবে ও। এবার তুমি ভেবে দ্যাখ, যদি আমার উপর ভরোসা করতে পার তো . . .!'

ছেলেটা জিতেন দাসের হাত জড়িয়ে ধরল – 'ছি ছি, একথা বলবেন না। আপনার উপর আমার পুরো ভরসা আছে। আমি স্টেশন চলে যাচ্ছি। আপনি ওকে পাঠিয়ে দেবেন!' আবেগে আপ্লুত ছেলেটি বলল – 'আপনি আমাদের যে উপকার করলেন, সেটা শোধ করবার নয়। আপনাদের কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। যদি কখনও কোনো উপকারে আসি . . .!'

ছেলেটা হঠাৎ থেমে গিয়ে একটু হাসল – 'আমি তো আমাদের দুজনের নামই আপনাদের বলিনি!'

জিতেন দাস আবার নিজস্ব কায়দায় হাত দেখিয়ে তাকে থামিয়ে দিল। ছেলেটা অপ্রস্তুত ভাবে, অবাক দৃষ্টিতে

জিতেনকে দেখল। জিতেন সেসব গ্রাহ্য না করে ছেলেটাকে বলল – 'তুমি আর দেরী কোরোনা। সময়মতো ট্রেনটা তো ধরতে হবে!'

হাতের ঘড়ির দিকে দেখে নিয়ে ছেলেটা জিতেনকে জিজ্ঞাসা করল – 'আমি কি কিচেনে একবার ওর সাথে কথা বলতে পারি ?'

– 'অবশ্যই, অবশ্যই!' জিতেন বলে উঠল। 'দেখা করে সব কিছু বুঝিয়ে বলে যাও।'

ছেলেটা রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই মেয়েটা ওর বুকে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। ছেলেটাও কাঁদছিলো, তবে নিঃশব্দে। একটু সামলে নিয়ে ছেলেটা ওকে পুরো পরিস্থিতি এবং পরিকল্পনা বুঝিয়ে বলল। মেয়েটা পুরো সময়টা শংকিত দৃষ্টিতে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ছিল। সব শুনে মাথা নেড়ে বলল – 'সাবধানে যেও !'

পেছন ঘোরার আগে ছেলেটা বলল – 'ভুলেও যেন মোবাইল অন কোরোনা। আমি ছ'নম্বর প্ল্যাটেফর্মে ম্যাগাজিন স্টলের কাছে থাকব। বিল্লুও আমাদের জিনিস পত্র নিয়ে ওখানে পৌঁছে যাবে !'

ছেলেটা চলে যেতেই জিতেন দাস তার মোবাইল ডায়াল করল – 'জগন্নাথ, তোমার ভ্যানটা নিয়ে শিগগির দোকানে চলে এসো!'

দশ মিনিটের মধ্যেই জগন্নাথ তার পাউরুটি সাপ্লাই-এর টেম্পো ভ্যানটা নিয়ে চা-ঘরের সামনে এসে হাজির হল। জিতেন তাকে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে ডেকে বলল – 'চটপট ভ্যানের পিছনে উঠে পড়। পথে সবসময় দরজা বন্ধ রাখবে, একবারও কিন্তু খুলবে না !'

মেয়েটা যেতে গিয়েও কি মনে করে ফিরে এসে জিতেনের পায়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করল। ভীষণ অপ্রস্তুত জিতেন 'আরে আরে' করে উঠল ! মেয়েটা এবার রঘুর হাত দুটো ধরে 'আসি ভাই বলে একবার মুরারীর দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে সোজা ভ্যানে উঠে পড়ল !

জগন্নাথের ভ্যানের আওয়াজ মিলিয়ে গেল !

দোকান ঘরে এখন ওরা তিন জন – জিতেন, মুরারী আর রঘু। উদ্বেগ মিটে যাওয়ায় ওদের মুখে এখন স্বস্তির হাসি। জিতেন দাস বড় একটা শ্বাস নিয়ে বলল – 'যাক বাবা, ছেলে মেয়ে দুটো এখন ভালোয় ভালোয় নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেলেই হয় !'

মুরারী চোখ বড় করে বলে উঠল – 'আরে রঘু, তুই আজকে যা জবরদস্ত নাটক করলি, আমি তো তাজ্জব বনে গেছি !'

জিতেন দাসও সায় দিল – 'সত্যি রঘু, তুই যে এমন গল্প বানাতে পারিস, তা তো জানতামই না!'

রঘু একখানা বিগলিত হাসি মুখে নিয়ে ঘাড় চুলকোচ্ছিল । জিতেন হঠাৎ সুর পাল্টে রঘুকে ধমকে উঠল – 'কিন্তু রঘু, তুই আমার নামে ওরকম বাজে কথা বললি কেন?'

হঠাৎ ধমক খেয়ে রঘু তো বটেই, মুরারীও ঘাবড়ে গেল !

জিতেন বলে চলল – 'আমি তোদের কথায় কথায় বকি ? মাইনে কেটে নিই ?'

দু কানে ধরে, জিভ কেটে কাচুমাচু হয়ে রঘু বলল – 'সরি, ভীষণ ভুল হয়ে গেছে। গল্প বানানোর ঝোঁকে একটু বেশি বলে ফেলেছি।'

রেগে রেগে জিতেন বলে – 'বলেছিসই তো। তার জন্য শাস্তি পেতে হবে। আয় এখানে আয়। গাঁট্টা খেয়ে যা !'

ভয়ে ভয়ে ধীর পায়ে জিতেনের সামনে গিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়ালো রঘু। জিতেন দাস হাতটা তুলল, কিন্তু গাঁট্টা মারল না। ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে স্নেহের সুরে বলল – 'বলেছিস, বেশ করেছিস। গল্প বিশ্বাসযোগ্য করতে কখনও কখনও একটু বেশি বলতে হয়। তবে একটা কথা মানতেই হবে, তোর বুদ্ধি আছে ! ভেবে দেখলাম, তোর পড়াশোনা করা উচিত। বীরেশ্বর মাস্টারও বলছিল যে লেখা পড়ায় তোর মাথা আছে; তবে পড়াশোনার জন্য তোর আর একটু বেশি সময় দরকার ! দেখছি, তারও একটা ব্যবস্থা আমি করে দেব!'

আনন্দে আপ্লুত রঘু কি করবে বুঝে না পেয়ে জিতেন দাসকে একটা প্রণাম করে ফেলল। তারপর রান্নাঘরের দিকে যেতে গিয়েও থেমে গিয়ে বলল – 'একটা কথা বলবে দাদু?'

– 'আবার কি ?'

– 'বলছিলাম, তুমি ছেলেটাকে পুরো কথাটা বলতে দিলে না কেন? ওদের গল্পটা তো শোনাই হল না ! এমন কি ওদের নাম ধামও শুনলে না।'

হা হা করে হেসে উঠলো জিতেন। হাসতে হাসতেই বলল – 'বুঝলি না, কেন শুনলাম না ? আরে জানলেই তো ঝামেলা !'

– 'মানে ?'

– 'দ্যাখ, ছেলে মেয়ে দুটো প্রেম করে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। এক্ষেত্রে খোঁজাখুঁজি হওয়াটাই স্বাভাবিক। পুলিশ কেসও হতে পারে। দুজনের ধর্ম আলাদা হলে আরো অনেক কিছু হতে পারে। সেসব নাহয় বাদ দিলাম। কিন্তু খোঁজ করতে এখানে লোকজন আসতেই পারে ! তবে আমরা তো ওদের নাম ধাম কিছুই জানি না। তাই আমরা বলব, আমরা কিচ্ছু জানিনা। ওদের চিনি না !'

রঘু জিজ্ঞাসা করল – 'কিন্তু ছবি দেখিয়ে যদি জানতে চায় ?'

– 'বলবি, রোজ কত লোক চা-ঘরে আসে। সবার মুখ মনে রাখা যায় নাকি ? তাছাড়া মুখের দিকে তাকিয়ে দেখার মত অত সময়ও আমরা পাইনা। মনে রাখিস, তোরা ওদের চিনিস না। ওদের ব্যাপারে কিচ্ছু জানিস না !'

প্রথম পর্ব গত ''সংকলন'' (দ্বাদশ সংখ্যা, জুলাই ২০১৮)-তে প্রকাশিত হয়েছে।

রমা জোয়ারদার – দিল্লীর বাংলা সাহিত্য মহলে একটি পরিচিত নাম। গত কুড়ি বছর ধরে দিল্লী, পশ্চিমবাংলা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্বেও তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলনঃ (১) রোজ নামচার ছেঁড়াপাতা; (২) সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ।

“রঙ লাগালে বনে বনে,
ঢেউ জাগালে সমীরণে ।।”